POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمًا

মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কাহারাও পিতা নহে, কিন্তু সে আল্লাহ্‌র রসুল এবং নবীগণের মোহর, এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞানী

(সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 9

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 31-32

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 1-8 Aug, 2024 2-25 মহররম-সফর 1445 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

সীরাতুন্নাবী (সা.) সংখ্যা

নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যত্মিকতা প্রতিষ্ঠার নিরিখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকার আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি। নবুওয়ত তাঁর সত্তাতে শুধু যুগের পরিসমাপ্তির কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুওয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

মহানবী (সা.) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। এ গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোন নবীই শরীক নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারা পৃথিবীকে এক অন্ধকারে পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাবে সেই অন্ধকার আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি এসেছেন ততক্ষণ তিনি মৃত্যুবরণ করেন নি যতক্ষণ সেই পুরো জাতি পৌত্তলিকতার আবরণ খুলে একত্ববাদের আবরণ পরে নিয়েছে। শুধু এটাই নয় বরং তাঁরা ঈমানের উন্নত মার্গে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁদের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানের এমন কার্যাবলী সাধিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এ সাফল্য এবং এ মার্গের সফলতা আঁ হযরত (সা.) ছাড়া অন্য আর কোন নবীর ভাগ্যে জোটে নি। আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার পক্ষে এটিই একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত ও আবির্ভুত হয়েছে, যখন যুগ চরম পর্যায়ের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর স্বভাবতঃই এমন এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতঃপর তিনি এমন একটি সময়ে ইন্তেকাল করেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করে তওহীদ (একত্ববাদ) ও সঠিক পথকে অবলম্বন করেছিল। আর প্রকৃতপক্ষে এ কামেল ও পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই (সা.) বিশেষত্ব। তিনি একটি বন্য স্বভাবের ও পশু প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় অভ্যাস শিখিয়েছেন। অথবা অন্যকথায় বলা যায়, পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদা- প্রেমিক মানুষ বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় মন্ত্র ফুৎকার করেছেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে খোদার পথে ছাগলের মত জবাই করা হয়েছে। তারা পিপীলিকার মত পদতলে পিষ্ট হয়েছেন;কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেন নি, বরং সব বিপদের সময় সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যত্মিকতা প্রতিষ্ঠার নিরিখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকার আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি।

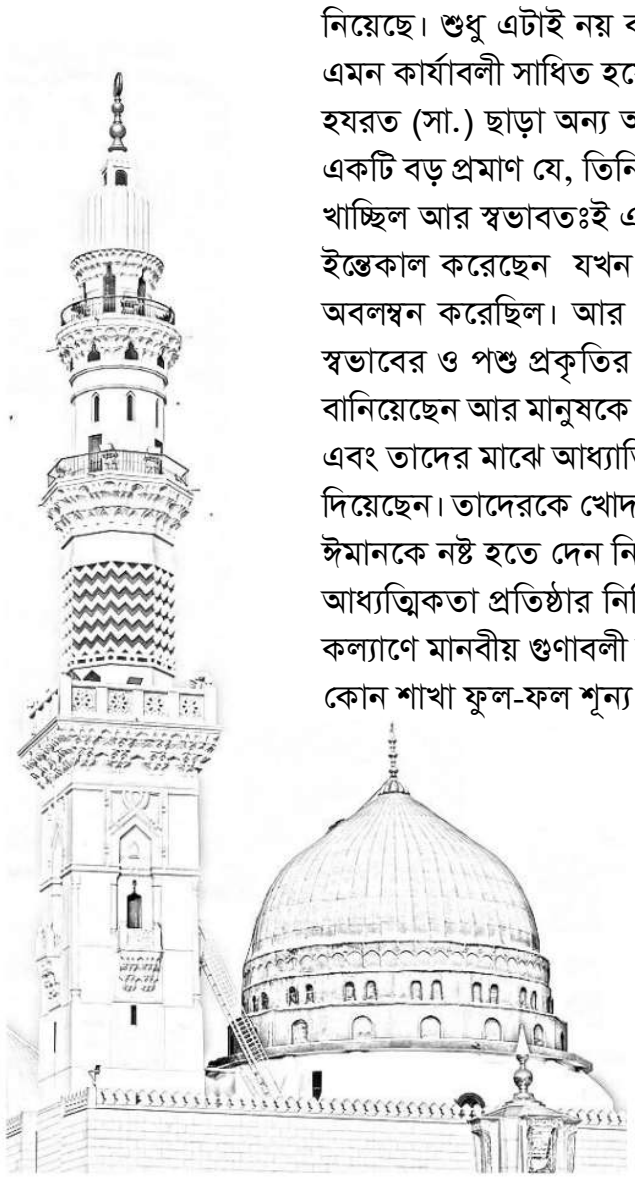

নবুওয়ত তাঁর সত্তাতে শুধু যুগের পরিসমাপ্তির কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুওয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া তিনি যেহেতু ঐশী গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন তাই তাঁর শরীয়ত যুগপৎ জালালী ও জামালীর (প্রতাপ ও সৌন্দর্য্যের) বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাঁর দু'টি নাম মুহাম্মদ ও আহমদের (সা) পিছনে এটিই উদ্দেশ্য। তাঁর সার্বজনীন নবুওয়তে কার্পণ্যের কোন দিক নেই; বরং সূচনা থেকেই তা বিশ্বজনীন।

(লেকচার লাহোর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

রসুল করীম (সা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

একটু ভাবা উচিত, সহস্র সহস্র বিপদাপদ মাথাচাড়া দেওয়া আর লক্ষ লক্ষ শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভয়প্রদর্শনকারী দণ্ডায়মান হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নবুয়্যতের দাবিতে কিভাবে অনড় ও অটল ছিলেন। বছরের পর বছর সেসব সমস্যার সম্মুখীন ছিলেন এবং সেসকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয় যা সলফলতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে নিরাশ করছিল আর প্রতিনিয়ত সেসব সমস্যা বেড়েই চলেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধরলেও কোন জাগতিক লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা তো ভাবাই যেত না, বরং নবী হওয়ার দাবি করে নিজের পূর্বের সহানুভূতিশীলদে হারিয়ে বসেছেন। এক কথা বলে লক্ষ বিভেদের কারণ হয়েছেন এবং সহস্র সহস্র বিপদাপদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত হয়েছেন। হত্যার জন্য পিছু ধাওয়া করা হয়েছে। ঘরদোর এবং সকল উপায় উপকরণ ধ্বংস ও বিনষ্ট করা হয়েছে। বারংবার বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। হিতাকাঙ্খীরা অনিষ্টকামী হয়ে গেছে। বন্ধুরা শত্রুতা আরম্ভ করেছে। দীর্ঘকাল তিক্ততার মাঝে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে, যার উপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকা কোন মিথ্যাচারী প্রতারকের জন্য সম্ভব নয়। দুঃখকষ্টের দীর্ঘ যুগাবসনে যখন ইসলাম জয়যুক্ত হয় তখন সম্পদ ও সম্মান হাতে মুঠোর পেয়েও কোন ধনভাণ্ডার পুঞ্জিভূত করেন নি, কোন অট্টালিকা নির্মাণ করেন নি, কোন বারগাহ (দরবার শরীফ) প্রস্তুত হয় নি, বাদশাহদের ন্যায় বিলাসী জীবনের কোন উপকরণ প্রস্তাব করা হয় নি। অন্য কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করেন নিবরং অর্থসম্পদ যা কিছু এসেছে পুরোটাই এতিম, মিসকীন, বিধবা ও ঋণগ্রস্তদের দেখাশোনার কাজে ব্যয় হতে থাকে।। একবেলাও কোন সময় পেটপুরে খাবার খান নি। আর এত স্পষ্টভাষী ছিলেন যে, শিরকের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে যে সকল জাতি শিরকে নিমজ্জিত ছিল তাদের সবাইকে বিরোধী সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। যারা ছিল আপনজন, মূর্তিপূজা বা শিরক হতে বারণ করে তাদেরকে সর্বপ্রথম শত্রু-সারিতে দাঁড় করিয়েছেন। হরেক প্রকার সৃষ্টিপূজা ও অপকর্ম হতে বারণ করে ইহুদীদের সাথেও সম্পর্ক নষ্ট করেছেন, হযরত ঈসাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ও অপমান করতে বারণ করেছেন। ..... এখন ইনসাফের দৃষ্টিতে দেখার বিষয় হল, বস্তুস্বার্থ সিদ্ধির কি এটিই রীতি?

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৮)

আঁ হযরত (সা.) ছিলেন কথা ও কাজে অভিন্ন,স্বচ্ছ-হৃদয়, খোদার জন্য জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত। সৃষ্টির উপর নির্ভর করা ও তাদের কাছে আশা-ভরসা রাখা হতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণরূপে বিমুখ, কেবল খোদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি। যিনি খোদার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদিত ছিলেন, আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি যে, একত্ববাদের ঘোষণার ফলে কী-কী বিপদ আমার উপর আপতিত হতে পারে আর মুশরিকদের হাতে কী-কী দুঃখ ও বেদনা আমাকে সইতে হবে। বংরং সকল দুঃখ-কষ্ট, কাঠিন্য ও সমস্যাবলী শিরোধার্য করে স্বীয় মনিবের নির্দেশ পালন করেছেন আর খোদার পথে সংগ্রাম, ওয়াজ ও নসীহতের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলীর সবকটি দৃষ্টিগোচর রেখেছেন। কোন ভয়প্রদর্শনকারীকে এতটুকু গুরুত্ব দেন নি। আমরা সত্য-সত্যই বলছি, নবীকুলের ঘটনাবলীতে ভয়াবহ বিপদাপদের মুখে খোদার উপর এভাবে ভরসা করে প্রকাশ্য শিরক ও সৃষ্টিপূজা থেকে বারণকারী আর এত শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও এরূপ দৃঢ়চিত্ততা ও অবিচলতা প্রদর্শনকারী একজনও দেখা যায় না।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

সহস্র সহস্র এমন ঘটনা রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) ঐশী মদদপুষ্ট ছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, এটি কি একটি বিস্ময়কর ঘটনা নয় যে, একজন বিত্ত ও শক্তিহীন নিরুপায় -নিরক্ষ এতীম আর নিঃসঙ্গ-দরিদ্র মানুষ সে সময় এমন সমুজ্জ্বল শিক্ষা নিয়ে এসেছেন যখন পৃথিবীর সকল জাতি আর্থিক, সামরিক ও জ্ঞানগত শক্তিতে ছিল সমধিক বলীয়ান আর তিনি স্বীয় অকাট প্রমাণ ও সুস্পষ্ট যুক্তির জোরে সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। বড় বড় লোকদের স্পষ্ট ভ্রান্তি চিহ্নিত করেছেন যারা বিজ্ঞ সাজতো আর দার্শনিক আখ্যায়িত হত। সহায়হীনতা ও দারিদ্র সত্ত্বেও সিংহাসন থেকে বাদশাহদের পতন ঘটনোর মত শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন আর সেসব সিংসহাসনে দরিদ্রদের সমাসীন করেছেন- এটি খোদার সাহায্য নয় তো আর কি ছিল?ঐশী সাহায্য ছাড়া কি সারা পৃথিবীর উপর বুদ্ধি, জ্ঞান, শক্তি ও ক্ষমতার জোরে জয়যুক্ত হওয়া যায়?

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	২
খুতবা জুমআ হুযুর আনোয়ার (আই.)	৩
বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী (সা.)-এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে	৮
ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রসুল করীম (সা.) এর শিক্ষা এবং তাঁর পবিত্র আদর্শ	৯
মহিলা সাহাবীয়াদের আত্মত্যাগ	১২
হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেবের জীবনী	১৫
হজ্জাতুল বিদার খুতবার আলোকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা	২১

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৮)

মহানবী (সা.) সে যুগে প্রেরিত হয়েছেন, যখনন সারা পৃথিবীতে শিরক, ভ্রষ্টতা ও সৃষ্টিপূজার রাজত্ব ছিল। সকলেই সত্য নীতি বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। সকল ফিরকা সঠিক পথ ভুলে এবং অন্যদের ভুলিয়ে বিদাতের নিত্যনতুন পথ অনুসরণ করছিল। আরবে প্রতিমাপূজার ভয়াবহ প্রচলন ছিল। পারস্যে অগ্নিপূজার বাজার গরম ছিল। ভারতে প্রতিমাপূজা ছাড়াও আরও শত শত প্রকার সৃষ্টিপূজা বিস্তার লাভ করেছিল। সে যুগেই অনেক পুরান (হিন্দুগ্রন্থ) এবং অন্যান্য পুস্তক লেখার কাজ সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল যা অনুসারে খোদার বহু বান্দাকে খোদার আসনে বসানো হয়েছে এবং অবতার পূজার ভিত রচিত হয়েছে। পাদ্রী ডেভন পোর্ট এবং আরও অনেক বিজ্ঞা ইংরেজের উক্তি অনুসারে সে যুগে খৃষ্টধর্মের চেয়ে অন্য কোন ধর্ম বেশি বিকৃত ছিল না। পাদ্রীদের নোংরা চালচলন এবং কলুষিত বিশ্বাসের কারণে খৃষ্টধর্ম মারাত্মকভাবে কলঙ্কিত হয় আর খৃষ্টধর্মে এক বা দু' ব্যক্তি নয় বরং অনেক কিছুই খোদার আসন দখল করে। যুগের বিরাজমান পরিস্থিতি একজন দক্ষ চিকিৎসক ও সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল আর যারপরনাই আবশ্যকতা ছিল ঐশী দিক- নির্দেশনার। সুতরাং এমন সর্বগ্রাসী ভ্রষ্টতার যুগে মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাব অধিকন্তু তাঁর পৃথিবীতে এসে বিশ্ব মানবতাকে একত্ববাদ ও সৎকর্মের মাধ্যমে আলোকিত করা এবং সকল দুষ্কৃতি মূল অর্থাৎ শিরক ও সৃষ্টিপূজা নির্মূল করা, একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসুল এবং রসুলদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১২ এর ১০ নম্বর টিকা)

মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় এই আপদ সর্বত্র বিস্তার করছিল। পৃথিবীর সকল জাতি সরল পথ, একত্ববাদ, নিষ্ঠা ও সততা বিসর্জন দিয়ে বসেছিল। এছাড়া একথা সর্বজনবিদিত যে, বর্তমান নৈরাজ্যের চিকিৎসাকারী এবং পৃথিবীকে শিরকের অন্ধকার ও সৃষ্টিপূজা থেকে বের করে একত্ববাদের প্রতিষ্ঠাকারী কেবল মহানবী (সা.)-ই, অন্য কেউ নয়। সুতরাং এপুরো ভূমিকার ফলাফল যা দাঁড়াল তা হলো, মহানবী (সা.) খোদার পক্ষ থেকে সত্যপথের দিশারী।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৪ এর ১০ নম্বর টিকা)

মহানবী (সা. কে সমগ্র বিশ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁর উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা অন্ততপক্ষে হাজার-দুহাজার নবীর কাজ ছিল। কিন্তু খোদা যেহেতু আদম সন্তানদের একই জাতি ও অভিন্ন গোত্রের রূপ দিতে চেয়েছেন, আরও চেয়েছেন যে, অচেনা ও অপরিচিতর ভাব মুছে ও ঘুচে যাক,আর যেভাবে একের মাধ্যমে এ ধারা সূচিত হয়েছে, অনুরূপভাবে একেই তা শেষ হোক। তাই তিনি শেষ হিদায়াতকে একযোগে সারা বিশ্বের জন্য প্রেরণ করেছেন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৬ এর ১০ নম্বর টিকা)

মহানবী (সা.)-এর স্বভাব বা প্রকৃতি ছিল ভারসাম্যের পরম মার্গে। সর্বত্র নম্রতাপ্রিয়ও ছিল না আর সকল ক্ষেত্রে ক্রোধ ও ক্ষোভের প্রকাশও তাঁর কাছে পছন্দনীয় বিষয় ছিল না, বরং প্রজ্ঞার দাবি অনুসারে তাঁর কল্যাণময় প্রকৃতি ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিকে দৃষ্টিতে রাখত। অতএব, পবিত্র কুরআনও সেই ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা বজায় রেখে অবতীর্ণ হয়েছে, যা একাধারে কঠোরতা, কোমলতা, ত্রাস, অনুকম্পা, নমনীয়তা ও দৃঢ়তার

এরপর ১৭ পাতায়....

সে এক রাজপুত্র এবং আধ্যাত্মিক বাদশাহদের নেতা, যার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হবে।

" যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, মুশরিকগণ অপবিত্র, নিকৃষ্টতম জীব, নির্বোধ, শয়তানের বংশধর এবং তাদের উপাস্য জাহান্নামের ইন্ধন ও অংশ তখন আবু তালেব আঁ হযরত (সা.)-কে ডেকে বলেন-

হে আমার ভাইপো! তোমার গাল-মন্দ শুনে জাতি বেজায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। খুব সম্ভব তারা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে এবং তার সঙ্গে আমাকেও। তুমি তাদের জ্ঞানীজনদেরকে নির্বোধ আখ্যায়িত করেছ এবং তাদের সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছ। তাদের সম্মানীয় উপাস্যদেরকে জাহান্নামের আগুন ও ইন্ধন বলেছ। এবং সকলকে অপবিত্র এবং শয়তানের বংশধর বলেছ। আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি যে, নিজের ভাষাকে সংযত কর এবং গাল-মন্দ থেকে বিরত হও। নচেত আমি পুরো জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার শক্তি রাখি না।

আঁ হযরত (সা.) উত্তরে বললেন- "হে চাচা! এটি গাল-মন্দ নয়। বরং এটি হল সত্য উদ্ঘাটন এবং যথোচিত বর্ণনা। এই কাজের জন্যই তো আমি প্রেরিত হয়েছি। এর কারণে যদি আমার মৃত্যুও আসে তথাপি আমি সানন্দে নিজের জন্য সেই মৃত্যুকে বরণ করব। আমার জীবন এই পথেই উৎসর্গিত। আমি মৃত্যু ভয়ে সত্য প্রকাশ থেকে বিরত হতে পারি না।

হে চাচা! যদি তুমি নিজের দুর্বলতা ও কষ্টের কথা চিন্তা কর তবে আমাকে আশ্রয় প্রদান করা থেকে নিরস্ত হও। খোদার কসম! আপনাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। আমি খোদার আদেশ পৌঁছানোর কাজে কখনো থেমে থাকব না। খোদার আদেশ আমার প্রাণের চেয়ে বেশি প্রিয়। খোদার কসম! যদি আমি এই পথে মৃত্যু বরণ করি, তবে এই আকাঙ্খাই পোষণ করি যেন পুনরায় জীবিত হয়ে চিরকাল এই পথেই মৃত্যু বরণ করতে থাকি। এটিই ভীতির স্থল নয়। বরং তাঁর পথে দুঃখ সহন করার মধ্যে আমি অসীম আনন্দ খুঁজে পায়।

আঁ হযরত (সা.) এই বক্তব্য রাখছিলেন তখন তাঁর চেহারায় সত্য ও জ্যোতির আভা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর সত্যের জ্যোতিঃ দেখে আবু তালেবের চোখ থেকে অশ্রুধারা বয়ে যেতে লাগল। তিনি বললেন- 'আমি তোমার এই মহান রূপ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। তুমি অসাধারণ গুণ ও নিদর্শনের আধার। যাও! নিজের কাজে মগ্ন হয়ে পড়। যতদিন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি, যতদুর পর্যন্ত আমার শক্তি আছে, তোমার সঙ্গ দিব। (ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন,৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১০)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

আবু তালেবের এই কাহিনীটি যদিও পুস্তকসমূহে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু এই সমস্ত লেখনী ইলহামী যা খোদা তা'লা এই অধমের হৃদয়ে অবতীর্ণ করেছেন। কেবল কোন কোন বাক্য ব্যাখার জন্য এই অধমের পক্ষ থেকে লেখা হয়েছে। এই ইলহামী ভাষা থেকে আবু তালেবের সহানুভুতি এবং আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। কিন্তু সন্দেহাতীত ভাবে এবিষয়টি প্রমাণিত যে, এই সহানুভুতি জন্মেছিল নবুয়তের জ্যোতিঃ ও অবিচলতার লক্ষণ দেখেই। আমাদের সৈয়্যদ ও মৌলা (সা.) জীবনের একটি বড় অংশ, প্রায় চল্লিশ বছর, অসহায়ত্ব, অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে অনাথ হয়ে অতিবাহিত করেছিলেন। কোন আত্মীয় বা কাছের লোক সেই যুগে নির্জনে আত্মীয়তা বা নিকটতার দায়িত্ব পালন করে নি। এমনকি সেই আধ্যাত্মিক বাদশাকে নিজের শৈশবে লাওয়ারিস শিশুদের মত কিছু যাযাবর মহিলাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় আর এই অসহায় ও নিঃস্ব অবস্থায় এই সৈয়্যদুল আনাম নিজের দুদ্ধপানের দিনগুলি অতিবাহিত করেন। কিছুটা সাবালকত্বে উপনীত হলে অনাথ অসহায় বালকদের মত, যাদের পৃথিবীতে কেউ থাকে না,যাযাবরা সেই মাখদুমুল আলামীন (বিশ্ব-সেবক) কে বকরী চরানো কাজে লাগায়। সেই অনটনের দিনগুলিতে নিকৃষ্ট ধরণের শস্য বা ছাগলের দুধ ছাড়া তাঁর জন্য অন্য কোন খাবার ছিল না। যৌবনে উপনীত হলে তাঁর চাচা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা বিবাহের জন্য কোন বিন্দু মাত্র চিন্তা করেন নি, যদিও তিনি অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। অবশেষে পঁচিশ বছর বয়সে দৈবক্রমে কেবল খোদার কৃপা ও অনুগ্রহে মক্কার এক ধনাঢ্য মহিলা আঁ হযরত (সা.) কে নিজে পছন্দ করে বিবাহ করেন। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, যে অবস্থায় আঁ হযরত (সা.)-এর নিজের চাচা আবু তালেব, হামযা এবং আব্বাস মজুদ ছিলেন এবং বিশেষ করে আবু তালিব মক্কার সর্দারও ছিলেন, তিনি জাগতিক ধন-সম্পদ, বৈভব, শক্তি ও প্রাচুর্যের অধিকারীও ছিলেন, কিন্তু তাদের এই প্রাচুর্য সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর সেই দিনগুলি বড়ই কষ্টে, অনাহারে এবং নিঃস্ব অবস্থায় কেটেছে। এমনকি যাযাবরদের ছাগল পর্যন্তও চরাতে হয়েছে। এমন যন্ত্রনাদায়ক অবস্থা দেখে কারো চোখে পানি আসে নি। আঁ হযরত (সা.) যখন পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন কোন চাচার মনে এই চিন্তাটুকুও উঁকি দেয় নি যে, আমরাও তো তার পিতৃতুল্য, বিবাহের মত জরুরী বিষয়ে কিছুটা চিন্তা তো করি, যদিও তাদের পরিবারে বা আত্মীয়স্বজনদের ঘরেও মেয়ে ছিল। এখানে স্বভাতই প্রশ্ন ওঠে যে, এতটা নিস্তেজতা কেন প্রকাশ পেল? এর আসল উত্তর হল, তারা আমাদের প্রিয় নবী (সা.) কে দেখল যে, এক অনাথ বালক যার পিতা-মাতা কেউ নেই, একেবারেই সহায়-সম্বলহীন, যার কাছে কোন প্রকারের ধন-সম্পদ নেই। সম্পূর্ণ নিঃস্ব। এমন বিপন্ন মানুষের সহানুভুতি করে লাভ কি? একে জামাতা করার অর্থ হল নিজের মেয়েকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। কিন্তু তারা একথা জানত না যে, সে এক রাজপুত্র এবং আধ্যাত্মিক বাদশাহদের নেতা, যার হাতে পৃথিবীর যাবতীয় ধন-ভাণ্ডারের চাবি দেওয়া হবে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"প্রকৃত প্রশংসা আল্লাহ্‌র প্রাপ্য, চোখ যার নাগাল পেতে পারে না। কিন্তু তিনি স্বয়ং চোখ পর্যন্ত পৌঁছান। তাঁর সম্পর্কে মানুষের বোধন থেকে কল্পনা এতটাই দূরে যতটা দিন থেকে রাত দূরে। সেই সত্তা যিনি কুরআন এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর মাধ্যমে শহর ও জঙ্গলের সমস্ত বাসিন্দাদের সার্বজনীনভাবে আহ্বান করেছেন। সালাম ও দরূদ বর্ষিত হোক খাতামান্নাবীঈন এবং নবীকুলের গর্ব তাঁর প্রিয় বান্দা মহম্মদ (সা.)-এর উপর, যিনি অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ নিয়ে এসেছেন, মানুষের সকল প্রয়োজন মিটিয়েছেন এবং সমগ্র জগতের সংশোধনের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অতএব, নিজেদের কামনা-বাসনাকে প্রদিক্ষণকারী অনেক মানুষ ছিল যারা আধ্যাত্মিক মানুষদের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। আর কতই না বিজ্ঞ ভাষাবিদ ও প্রতাপশালী মানুষ ছিল যারা অত্যন্ত শিষ্ট ও পবিত্র হয়ে উঠল। হে আল্লাহ্! এই রসূল ও উম্মী নবীর উপর দরূদ প্রেরণ কর যিনি পরাকাষ্ঠায় সকল রসূলদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং যিনি নিজের জীবনধারা ও গুণাবলীতে প্রত্যেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং মানুষদের মনে অনুরাগ ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন যারা কপট ছিল, নিষ্ঠাবান ছিল না। আর এমন এক জাতির সংশোধন করলেন, যারা মুশরিক ছিল, একেশ্বরবাদী ছিল না। তিনি এমন মানুষদেরকে পবিত্র করেছেন, যারা দুরাচারী ছিল, খোদাভীরু ছিল না। যারা নিজেদেরকে অলস হয়ে বসিয়ে রেখেছিল, তারা আল্লাহ্‌র পথে চলত না, তারা জেগে ছিল না। রসূলে করীম (সা.) উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন, যিনি ধর্মীয় বা জাগতিক কোন শিক্ষাই অর্জন করেন নি। তিনি এক এক নিরক্ষর ও অন্ধ জাতির মধ্যে লালিত পালিত হয়েছেন। তিনি কোন পণ্ডিত ও তত্ত্বজ্ঞানীদের চেহারা পর্যন্ত দেখেন নি, এমনকি তিনি কোন দিন বাড়ি থেকে বাইরে গেছেন আর না কখনও কোন বন্ধু ও প্রতিবেশীদের ছাড়া সফরে গেছেন। তাসত্ত্বেও তিনি সমস্ত আলেম এবং সমগ্র পৃথিবীর মানুষের থেকে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি, আশিস, কল্যাণ এবং (ঐশী) জ্যোতির ক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়েছেন। এমনকি তাঁর হেদায়েতের পারদর্শিতা পুর্ব-পশ্চিম, আপন-পর সকলকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এবং প্রত্যেক আঁচলধারী তাঁর আশিসের দিকে নিজেদের আঁচল প্রসারিত করেছে। তাঁর কল্যাণ ও আশিসের দিকে লোকেরা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অতএব তিনি মানুষকে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং তাদেরকে ভেদাভেদ এবং অন্ধকারপূর্ণ পথ থেকে মুক্তি দান করেছেন এবং তাদেরকে যাবতীয় প্রকারের কপটতা, ভেদাভেদ, কলহ-বিবাদ এবং দুষ্কৃতির গুণ থেকে পবিত্র করেছেন। এছাড়াও তিনি চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন, সন্দিগ্ধহীনতার সৃষ্টি করেছেন এবং বন্দীদের মুক্তি দিয়েছেন। এমনকি তিনি মানুষের মনে সমপর্ণ ও সন্তুষ্টির স্পৃহা সৃষ্টি করেছেন। তাদের কুফরের আবেগকে প্রশমিত করেছেন এবং তাদেরকে অবিচলতা দান করেছেন।..... এবং নিজের পায়ে দাঁড় করিয়েছেন। তারা দেখতে আরম্ভ করে এবং নিজেদের পথ ও গন্তব্য দেখে নেয় এবং গন্তব্য ঠিক করে ফেলে এবং সুশীতল ও সুমিষ্ট পানির ঘাটে অবতরণ করে। তাদের পবিত্রকরণ করা হয় এবং তাদেরকে এমনভাবে পবিত্র করা হয় যে তারা মানবকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে অভিহিত হয়।

(কেরামাতুস সাদিকীন, উর্দু অনুবাদ: পৃষ্ঠা: ৫)

জুমআর খুতবা

ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর ওপর যুদ্ধ এবং হত্যা ও লুটপাট, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আপত্তিকারীদের দেখা উচিত যে, এখন মহানবী (সা.) উক্ত ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আর ইহুদীও তারা যারা কিনা অনবরত চুক্তিভঙ্গ করে গিয়েছে, সে-সব লোক যারা বেশ কয়েকবার মহানবী (সা.)-কে, যিনি কি না মদীনা রাষ্ট্রের শাসকও ছিলেন, তাঁকে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র ও চেষ্টাও করেছিল আর একসময় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রীতিমতো বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল আর উক্ত অবরোধকালেও একবার তিনি (সা.) নতুনভাবে চুক্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দিলে একান্ত দম্ভভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এখন অবশেষে যখন মহানবী (সা.) তাদের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাদেরকে যত কঠোর শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন তা বৈধ হতো, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর শান্তিপ্রিয়তা ও আপসকামিতা এবং মানুষের প্রতি দয়া ও স্নেহের অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি এখানে প্রকাশ পায় যে, তিনি (সা.) তাদেরকে এখান থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অধিকন্তু দয়া ও উদারতার অবস্থা এই ছিল যে, একইসাথে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, অস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যতিরেকে যে আসবাবপত্র ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ারত থাকুন। আল্লাহ তা'লা সেখানকার সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায়উন্নতি দিন আর আহমদীদের নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখুন।

সারা বিশ্বের মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন। তারাও যেন যুগ-ইমামকে মান্য করে নিজেদের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। পৃথিবীতে যুদ্ধের যে সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্যও দোয়া করুন।

ইহুদীরা দেশান্তরিত হওয়ার সময় তাদের উটের ওপর নারী ও শিশুদের ছাড়া নিজেদের সেসব আসবাবপত্রও বোঝাই করে নেয় যা উট নিয়ে যেতে পারতো, শুধু অস্ত্র ছেড়ে দেয়। তাদের সাথে মোট ছয়শ' উট ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলে এর কাঠের দরজা, জানালা ইত্যাদি উটে বোঝাই করে নিয়ে যায়।

পৃথিবীর পরিস্থি তি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা দেখে এখন তো মনে হচ্ছে, যুদ্ধ হবেই হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক আহমদী ও প্রত্যেক নিষ্পাপকে যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ২৮ শে জুন, ২০২৪, এর জুমুআর খুতবা (২৮ শাহাদত ১৪০৩ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বনু নযীরের সাথে যুদ্ধের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন তা হলো, 'মহানবী (সা.) যখন বনু নযীরের একটি দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি তাঁর অবর্তমানে মদীনার বসতিতে ইবনে মাকতুম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন আর স্বয়ং সাহাবীদের একটি দলের সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে বনু নযীরের বসতি অবরোধ করেন আর সে যুগের রণরীতি অনুযায়ী বনু নযীর দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত তখনই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিকরা বনু নযীরের নেতাদেরকে এ সংবাদ পাঠিয়েছিল যে, তোমরা মুসলমানদের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না; আমরা তোমাদের সাহায্য করব এবং তোমাদের পক্ষ থেকে লড়াই করব। কিন্তু বাস্তবে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন বনু নযীরের প্রত্যাশার বিপরীতে এসব মুনাফিকরা আর প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-এর বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস পায় নি। আর বনু কুরায়যাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বনু নযীরকে সাহায্য করার সাহস করে নি। যদিও মনের দিক থেকে তারা তাদের সাথে ছিল আর সংগোপনে তাদের সাহায্যও করত, যা মুসলমানরা জেনে গিয়েছিল। যাহোক, বনু নযীর উন্মুক্ত প্রান্তরে মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য বের হয় নি, বরং দুর্গাবদ্ধ হয়ে বসে থাকে; কিন্তু সেই যুগের নিরিখে তাদের দুর্গ যেহেতু খুবই সুরক্ষিত ছিল, তাই তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে; মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না আর অবশেষে মুসলমানরা স্বয়ং বিরক্ত হয়ে অবরোধ তুলে নেবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই যুগের অবস্থানুসারে এ ধরনের দুর্গ জয় করা সত্যিই অনেক কঠিন ও কষ্টসাধ্য একটি কাজ ছিল এবং এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবরোধের দাবি রাখত।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.পৃ: ৫২৬)

যাহোক, মহানবী (সা.) সেখানে যান। তিনি (সা.) বনু নযীরের (দুর্গ) অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এ অবরোধ ছয় দিন এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে পনেরো দিন পর্যন্ত (বহাল) থাকে। এছাড়া বিশ এবং তেইশ দিনের ভাষ্যও বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা একথাও বলেছে যে, বিশ বা তেইশ দিন (অবরোধ) ছিল। অবরোধকালে মহানবী (সা.) কয়েকটি গাছ কাটার ও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন, কেননা ইহুদীরা যেহেতু দুর্গের প্রাচীর থেকে তির ও পাথর নিক্ষেপ করছিল এবং এসব গাছ তাদের জন্য প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করত আর তাদের ঘাঁটি হিসেবে কাজ করছিল। (অর্থাৎ) এসব গাছ লুকানোর স্থানে পরিণত হচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.) আবু লায়লা মা'যনী (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্

বিন সালাম (রা.)-র ওপর সেসব গাছ পুড়িয়ে ফেলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটি যুদ্ধের কিংবা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে করা হয়েছিল, বাগান ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়; কেননা ইসলামে (অযথা) বৃক্ষরাজি কাটা নিষিদ্ধ। এরপর লেখা আছে, আবু লায়লা মা'যনী (রা.) তাদের আজওয়া খেজুরের গাছগুলোতে আগুন লাগাচ্ছিলেন আর আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.) আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুরের গাছ পোড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়েতে এটিও আছে, নিম্নজাতের খেজুরের গাছগুলো পোড়ানো হয়েছিল। আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা করব। যাহোক, এই রেওয়ায়েতে যা লেখা আছে তা হলো, হযরত আবু লায়লা (রা.) বলেন, এই গাছগুলো তাদের মূল্যবান সম্পদ। এগুলো পোড়ালে তারা অনেক বেশি দুঃখ পাবে। ইহুদীদের অনেক কষ্ট হবে, কেননা এগুলো তাদের মূলধন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ মহানবী (সা.)-এর জন্য মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বানাবেন। আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-র এই বাক্য থেকেও এটি স্পষ্ট হয় যে, আজওয়া খেজুরের গাছ যা অনেক মূল্যবান গাছ সেগুলো পোড়ানো হয় নি। অন্যান্য গাছ পোড়ানো হয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আজওয়া সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। তিনি (রা.) আরও বলেন, এগুলো মহানবী (সা.)-এর কাজে আসবে। ইহুদীরা যখন এই গাছগুলোকে আগুনে পুড়তে দেখে তখন তাদের মহিলারা বুক চাপড়াতে থাকে, মুখে চপেটাঘাত করতে থাকে এবং আহাজারি করতে থাকে। এরপর ইহুদীরা তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তো অনেক সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী। আপনি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে বারণ করেন এবং কোনো অবস্থাতেই বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। (অথচ) এখন আপনি নিজেই এ কাজ করছেন? কিন্তু যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, এই গাছগুলো তাদের জন্য লুকোনোর স্থান ও প্রতিরক্ষার কাজ করছিল। তাই তাদের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল। এর মাঝে এই প্রজ্ঞাও নিহিত ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের এই শক্তি নির্মূল হোক যেন আরও বেশি রক্তপাত না হয়। এছাড়া মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ এলহামের আলোকে তিনি (সা.) এই গাছ পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি ইহুদীদের এই আপত্তির উত্তর আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিয়েছেন

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ

(সূরা আল-হাশর: ৬) অর্থাৎ, তোমরা যে খেজুর গাছই কেটেছ বা তাকে তার মূ লের ওপর দণ্ডায়মান ছেড়ে দিয়েছ, বস্তুত তা ছিল আল্লাহ্র আদেশে এবং এজন্য ছিল, যেন তিনি দুষ্কৃতকারীদের লাঞ্ছিত করেন ।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) অবরোধের সময় ইহুদীদেরকে পুনরায় এক দফা ক্ষমা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। অতএব তিনি (সা.) ইহুদীদেরকে বলেন, إِنَّكُمْ وَاللّٰهِ لَا تَأْمَنُوْنَ عِنْدِيْ إِلَّا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُوْنِيْ عَلَيْهِ (উচ্চারণ: 'ইন্নাকুম ওয়াল্লাহি লা তা'মানূনা ইনদী ইল্লা বিআহ্দিন তুয়াহিদু নী আলাইহি')

অর্থাৎ, তোমাদের ওপর আমার কোনো আস্থা নাই; এতদ্ব্যতীত যে, তোমরা আমার সাথে নতুনভাবে কোনো দৃঢ় চুক্তি সম্পাদন করো। কিন্তু তারা চুক্তি করতে অস্বীকার করে। ইহুদীরা সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদের লোভী হয়ে থাকে। তাদের মূল্যবান গাছ যখন পোড়ানো হয় তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে এলাকা ছাড়তে সম্মত হয়ে যায়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৫]

আমি (উপরোক্ত) বিবরণ একটি জীবনীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছি। এখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-র যে জীবনীগ্রন্থ আছে তার বরাতে উল্লেখ করছি। (এ সম্পর্কে তিনি) লিখেছেন, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মুসলমানরা লাগাতার অবরোধ করে রাখে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। অবরোধের কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পরও যখন কোনো কাজ হচ্ছিল না এবং বনু নযীর রীতিমতো প্রতিরোধে অবিচল থাকে তখন মহানবী (সা.) আদেশ প্রদান করেন, দুর্গের বাইরে থাকা বনু নযীরের এসব খেজুর গাছগুলোর মধ্য হতে কিছু গাছ কেটে ফেলা হোক। যে গাছগুলো কাটা হয়েছে সেগুলো 'লীনা' জাতের খেজুর গাছ ছিল, যা নিম্নজাতের খেজুর ছিল। যার ফল সাধারণত মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। আর এই নির্দেশের পেছনে অভিপ্রায় ছিল, যেন এই গাছগুলোকে কর্তিত হতে দেখে বনু নযীর গোত্র ভীতত্রস্ত হয় এবং নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয়। আর এভাবে কিছু গাছের ক্ষতির মাধ্যমে অনেক মানুষের প্রাণনাশের ক্ষতি এবং দেশের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা রোধ হয়। অতএব, এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়। মাত্র ছয়টি গাছই কাটা হয়েছিল; এরই মধ্যে বনু নযীর সম্ভবত এই ধারণা করে যে, হয়ত মুসলমানরা তাদের সব গাছ কেটে ফেলবে যার মধ্যে ফলবান গাছও ছিল; তারা হা-হুতাশ করতে আরম্ভ করে। অথচ পবিত্র কুরআনে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শুধুমাত্র কয়েকটি গাছ আর তা-ও লীনা জাতের (খেজুর) গাছ কাটার অনুমতি ছিল এবং অন্যান্য গাছ সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া ছিল। আর এমনিতে সাধারণ অবস্থায়ও মুসলমানদের জন্য শত্রুদের ফলবান বৃক্ষ কর্ত নের অনুমতি ছিল না। যাহোক, এই কৌশল কার্যকর হয় আর বনু নযীর ভীত হয়ে পনেরো দিনের অবরোধের পর এই শর্তে দুর্গে র দ্বার খুলে দেয় যে, আমাদের এখান থেকে নিজেদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যেতে দেওয়া হোক। এটি সেই শর্তই ছিল যা মহানবী (সা.) স্বয়ং প্রথমে উপস্থাপন করেছিলেন। আর যেহেতু তাঁর (সা.) নিয়্যত ছিল কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, তাই তিনি (সা.) মুসলমানদের এই কষ্ট এবং সেসব ব্যয়কে উপেক্ষা করেন, যা এই অভিযানে তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল। এখনও [তিনি (সা.)] বনু নযীর-এর এই শর্ত মেনে নেন আর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে দায়িত্ব দেন, তিনি যেন নিজের তত্ত্বাবধানে বনু নযীর গোত্রকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনাথেকে বিদায় করেন।"

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.পৃ: ৫২৬-৫২৭)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যেমনটি লিখেছেন যে, উন্নত মানের খেজুর গাছ কাটা হয় নি। অনুরূপভাবে বুখারীরও একটি ব্যাখ্যাপুস্তকে একথা লেখা হয়েছে, যার রেওয়ায়েত হলো এই যে, অর্থাৎ তার বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, রেওয়ায়েত সমূহের বিস্তারিত বর্ণনায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রথমত যে-সব খেজুর গাছ জ্বালানো হয়েছিল সেগুলো উন্নত মানের খেজুর ছিল না, বরং সাধারণ ও অকেজো ধরনের খেজুর ছিল যা সাধারণত মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতো না।

(নেয়ামাতুল বারী, ফি শারাহ সহীহ আল বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৩, হাদীস-৪০৩১)

অধিকন্তু কেবল ছয়টি বৃক্ষ জ্বালানো হয়েছিল, যেমনটি সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকেও বর্ণিত হয়েছে।

ইহুদীদের নিরুপায় হওয়া এবং তাদের স্বয়ং দেশান্তরের প্রার্থনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা উক্ত গোত্রের ইহুদীদের গাছ পুড়িয়ে তাদেরকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন। তাদের উদ্যম হারিয়ে যায় আর তারা অস্ত্র সমর্পণে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা আল্লাহ্র রসূল (সা.)-কে বলে পাঠায় যে, আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ দেশান্তরের সুযোগ দিন। তিনি (সা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন আর নির্দেশ দেন যে, মদীনা থেকে বেরিয়ে গেলে তোমাদের প্রাণ সুরক্ষিত থাকবে। তোমাদের উট যেসব আসবাবপত্র বহন করতে পারে তা -ও নিয়ে যাও, অস্ত্র ব্যতিরেকে। ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর ওপর যুদ্ধ এবং হত্যা ও লুটপাট, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আপত্তিকারীদের দেখা উচিত যে, এখন মহানবী (সা.) উক্ত ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আর ইহুদীও তারা যারা কিনা অনবরত চুক্তিভঙ্গ করে গিয়েছে, সে-সব লোক যারা বেশ কয়েকবার মহানবী (সা.)-কে, যিনি কি না মদীনা রাষ্ট্রের শাসকও ছিলেন, তাঁকে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র ও চেষ্টাও করেছিল আর একসময় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রীতিমতো বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল আর উক্ত অবরোধকালেও একবার তিনি (সা.) নতুনভাবে চুক্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দিলে একান্ত দম্ভভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এখন অবশেষে যখন মহানবী (সা.) তাদের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাদেরকে যত কঠোর শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন তা বৈধ হতো, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর শান্তিপ্রিয়তা ও আপসকামিতা এবং মানুষের প্রতি দয়া ও স্নেহের অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি এখানে প্রকাশ পায় যে, তিনি (সা.) তাদেরকে এখান থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অধিকন্তু দয়া ও উদারতার অবস্থা এই ছিল যে, একইসাথে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, অস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যতিরেকে যে আসবাবপত্র ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো।

অতএব, পরবর্তীতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে যে, ইহুদীরা এই ক্ষমা ও দানকে এমনভাবে কাজে লাগায় যে, নিজেদের ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়ে ছয়শ' উটের ওপর আসবাবপত্র বোঝাই করে নিয়ে যায়। আর নিজেদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এভাবে করে যে, যেসব জিনিস সাথে নিয়ে যেতে পারছিল না সেগুলো নষ্ট করার পূর্ণ চেষ্টা করে। অতএব,তারা নিজেদের বাড়িঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলোকে ভূপাতিত করে দেয় যেন তা মুসলমানদের কাজে না আসে। অর্থাৎ ঘরবাড়িও ভেঙে দিয়ে যায়। দেশান্তরের জন্য অর্থাৎ বনু নযীর গোত্রের নির্বাসনের যেসব শর্ত নিরূপণ করা হয়েছিল, সেসব শর্তের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১. বনু নযীর গোত্রের ইহুদীরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। এটি হলো প্রথম কথা। তারা অর্থাৎ বনু নযীর গোত্রের লোকেরা মদীনা ছেড়ে যাবে, বাকি যেখানে খুশি চলে যাক। অর্থাৎ যেখানে যেতে চায় যেতে পারে। ইহুদীরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দেশান্তরিত

হওয়ার সময় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র থাকবে। অস্ত্র ব্যতিরেকে ইহুদীরা তাদের ধনসম্পদ যতটা নিজেদের উটে করে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাবে। ৪. ইহুদীদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ নিয়ে যাওয়ার পর তাদের স্থাবর-অস্থাবর যেসব সম্পদ রয়ে যাবে সেগুলোতে মুসলমানদের মালিকানা হবে।

দেশান্তরের কাজের তদারকি এবং ইহুদীদের ওজর ও বাহানা করা সম্পর্কে ও বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, বনু নযীরকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিতাড়িত করার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র ওপর দেওয়া হয়। তখন ইহুদীরা আরেকটি ওজর এটি করে যে, এখানকার অনেক লোক আমাদের কাছে ঋণী; নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তারা সেই ঋণ পরিশোধ করবে। সেগুলোর কী হবে? তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে যেন মদীনায় থাকার আরও সুযোগ তাদের লাভ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা সুদ ছেড়ে দিয়ে ঋণের অর্থ কমিয়ে দাও এবং দ্রুত করো। অর্থাৎ ঠিক আছে, ঋণ তোমরা ফেরত পাবে; তবে শর্ত হলো তোমাদেরকে সুদ মাফকরে দিতে হবে। কিন্তু এখান থেকে দ্রুত বের হয়ে যাও।আবু রাফে' সালাম বিন আবি হুকায়েক, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-র কাছে ১২০ দিনার পেতো। অতএব, তিনি চল্লিশ দিনারের সুদ মাফ করে দিয়ে মূল অর্থ আশি দিনার গ্রহণ করে।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া,৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৪)

অনুরূপ আরও অনেক লোক থাকবে। মহানবী (সা.) যখন দেশান্তরের শর্ত আরোপ করেন তখন আবু রাফে' সালাম বিন আবি হুকায়েক, হুয়ী বিন আখতাবকে বলে, তোমার মন্দ হোক, এর চেয়েও মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে নাও। হুয়ী বলে, এর চেয়ে মন্দ পরিণাম আর কী হতে পারে?আবু রাফে' বলে, আমাদের সন্তানদের বন্দি করা হবে, আমাদের যোদ্ধারা নিহত হবে আর আমাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের করায়ত্তে চলে যাবে। আর সম্পদ ছেড়ে দিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সহজ। যদি আমরা কোনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করি তাহলে এর পরিণাম হবে মৃত্যু ও বন্দি হওয়া। হুয়ীদুএকদিন এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। যখন ইয়ামিন বিন উমায়ের এবং আবু সা'দ বিন ওহাব তার এই দ্বিধান্বিত অবস্থা দেখে তখন তাদের একজন অপরজনকে বলে, নিঃসন্দেহে তোমার জানা আছে যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। অতএব, তুমি কীসের অপেক্ষা করছো? আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। আমাদের তো জানা আছে আর আমাদের কিতাব থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের ইসলাম গ্রহণই উত্তম হবে। এভাবে আমাদের সম্পদ ও প্রাণ সুরক্ষিত হয়ে যাবে। অতএব, তারা রাতের অন্ধকারে নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয় আর মুসলিম বাহিনীর কাছে আসে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ সুরক্ষিত করে নেয়। এভাবে এই দুজন মুসলমান হয়ে যায়।

ইয়ামিন বিন উমায়ের পরবর্তীতে অনেক নিষ্ঠাবান সাহাবী প্রমাণিত হন। বরং তার হৃদয়ে সেই দিনগুলোতেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি এতটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, বনু নযীর গোত্রের যেই ইহুদী আমর বিন জাহাশ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিল, সে উক্ত ইসলাম গ্রহণকারী ইয়ামিন বিন উমায়ের(রা.)-রই চাচাতো ভাই ছিল। অতএব, এই নিষ্ঠাবান নবমুসলিম এক ব্যক্তির দ্বারা আমর বিন জাহাশকে হত্যা করান। মহানবী (সা.) যখন তার এই নিষ্ঠা ও ভালোবাসার কথা জানতে পারেন তখন তিনি আনন্দিত হন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

এটি ইতিহাসের একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি। ইহুদীদের দেশান্তরের অবস্থা সম্পর্কে লেখা আছে যে, ইহুদীরা দেশান্তরিত হওয়ার সময় তাদের উটের ওপর নারী ও শিশুদের ছাড়া নিজেদের সেসব আসবাবপত্রও বোঝাই করে নেয় যা উট নিয়ে যেতে পারতো, শুধু অস্ত্র ছেড়ে দেয়। তাদের সাথে মোট ছয়শ' উট ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলে এর কাঠের দরজা, জানালা ইত্যাদি উটে বোঝাই করে নিয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা নিজেদের বাড়ির খুঁটি এবং ছাদও ভেঙে ফেলে। দরজার চৌকাঠ , কপাট এমনকি দরজার খিল এবং চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। আর শুধুমাত্র হিংসা ও আক্রোশের বশে (তারা) নিজেদের বাড়িঘরের দেওয়াল পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয় যেন তাদের নির্বাসনের পর সেগুলো মুসলমানদের ব্যবহারযোগ্য না থাকে।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬১)

ইহুদীরা যখন তাদের সন্তানসন্ততি এবং নারীদের যাত্রীবাহী উটের ওপর আরোহণ করায় এবং অন্যান্য (মালবাহী) উটের ওপর মালামাল বোঝাই করতে থাকে, তখন তাদের আচার আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের মাঝে নির্বাসনের কারণে কোনো দুশ্চিন্তা বা অনুশোচনা নেই। অথচ তাদের অন্তর (হিংসার) আগুনে জ্বলছিল। হৃদয় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছিল যেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মোটের ওপর লোকদের এটি বুঝাতে চাচ্ছিল যে, আমরা সানন্দে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এরা প্রথমে বনু হারেস বিন খাযরাজ-এর এলাকা অতিক্রম করে, জিসর অতিক্রম করে, এরপর মদীনা মুনাওয়ারার বাজার দিয়ে তারা অতিক্রম করে। (জিসর হলো মদীনার একটি বাজারের নাম।) যাহোক, তারা তাদের নারীদের সাজিয়ে-গুজিয়ে উটের হাওদায় বসিয়ে রেখেছিল। (তাদেরকে) উটের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল আর একইসাথে গানবাজনার তালে তালে তাদের নর্তকিরা নৃত্যও করছিল। এরা সবার সামনে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাচুর্য প্রদর্শন করছিল যেন মানুষ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। আবু রাফে' চামড়ার তৈরি একটি থলে সোনা-রূপায় ভরে রেখেছিল। সেটিকে উঁচিয়ে তুলে ধরে বলছিল, আমরা এই অর্থ এহেন পরিস্থি তি মোকাবিলাকরার এবং বিজয়লাভের জন্য রেখেছিলাম! তাদের যাত্রার দৃশ্য এমন ছিল- গান গাচ্ছিল, সানাই বাজছিল, উত্তেজক পঙ্‌ক্তি পাঠ করছিল এবং নৃত্য-গীত করছিল। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) তাদের হীনতা উপেক্ষা করেন। এসব দেখা সত্ত্বেও তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দেন নি। তারা যদি অন্য কোনো জাতির মুখোমুখি হতো তাহলে হয়ত শরীর ঢাকার মতো কোনো কাপড়ও তাদেরকে দেওয়া হতো না।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৭)
(মাকালাত মদিনা মনোয়ারা, পৃ: ১৪২)

যে পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে আচরণ প্র দর্শন করেছিল তাতে তাদের এমন শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল যে, কিছুই নিয়ে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু মহানবী (সা.) স্বীয় মার্জনা এবং করুণার কারণে এসব বিষয়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন নি।

বনু নযীরের নতুন ঠিকানা কোথায় হয়েছিল- এ সম্পর্কে লেখা আছে, বনু নযীর যখন দেশান্তরের নির্দেশ পায় তখন তাদের জন্য সমগ্র আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল না বরং কেবল মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করা আবশ্যক ছিল । শুধুমাত্র মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এছাড়া যেখানে ইচ্ছা বসতি স্থাপন করতে পারতো। অতএব, তাদের মধ্য হতে কিছু সিরিয়ার আযরিয়াত অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং অধিকাংশ খায়বার অভিমুখে যায়। খায়বার, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি আরব উপদ্বীপে বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের এত বড়ো কেন্দ্র ছিল যে, এখানে সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যাই ছিল দশ হাজার। এছাড়া ইহুদীদের অনেক দুর্গও সেখানে ছিল এবং এই অঞ্চলটি কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। আরব উপদ্বীপের সকল ইহুদী বনু নযীরের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল, কেননা এরা নিজেদেরকে হযরত হারুন (আ.)-এর বংশধর বলে দাবি করত। এছাড়া বনু নযীরের এই লোকেরা সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি ভীষণ ধূর্ত ও চতুর ছিল। কাজেই, বনু নযীরের লোকেরা যখন খায়বারে চলে যায় তখন সেখানে ইহুদীদের শক্তি ও ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। তাদের মাঝে বনু নযীরের জ্যেষ্ঠ হুয়ী বিন আখতাব, সালাম বিন আবিল হুকায়েক এবং কিনানা বিন রবী'র মতো লোকেরাও ছিল। খায়বারের ইহুদীরা রণনৈপুণ্য ও দক্ষতায় অনন্য ও সেরা ছিল (অর্থাৎ খায়বারের লোকেরা যুদ্ধের দিক দিয়ে ভীষণ দক্ষ ছিল;) কিন্তু বনু নযীরের ইহুদীরা যুদ্ধের চেয়ে রাজনৈতিক দূরদর্শি তায় অগ্রগামী ছিল। রাজনীতির দিক দিয়ে বনু নযীরের অধিবাসীরা অনেক বিচক্ষণ ছিল। খায়বারে পা রাখতেই তারাঅর্থাৎ, বনু নযীরের লোকেরা খুব সহজেই নিজেদেরকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে আর এর ফলে খায়বার মুসলমানদের জন্য একটি প্রধান রণাঙ্গনে পরিণত হয়।

(সীরাত এনসাইক্লোপেডিয়া, ৭ম খন্ড, পৃ: ৫৭-৫৮)

বনু নযীরের ইহুদীদের সাথে আনসার পুত্রদের যাবার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, বনু নযীরের কিছু মানুষ মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে সিরিয়ার আযরিয়াত অঞ্চল অভিমুখে চলে যায়। সেসব ইহুদীর মাঝে কয়েকজন মুসলমান আনসারের পুত্রও ছিল। এর কারণ হলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের এই রীতি ছিল, যদি কোনো আনসার নারীর সন্তান জীবিত না থাকত তাহলে সেই নারী এ মানত করত, যদি তার পুত্র বেঁচে থাকে তাহলে সে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেবে। অতএব, এমন অনেক মানুষ ছিল আনসারের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও যাদেরকে ইহুদী বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন বনু নযীরের লোকেরা দেশান্তরিত হতে থাকে তখন সেসব পুত্রের পিতারা বলে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে যেতে দেবো না। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য এই ওহী অবতীর্ণ করেন; সীরাতে হালাবিয়ায় একথা লেখা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, লা ইকরাহা ফিদ্দীন। অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই।

(সীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন, বনু নযীর অনেক ধুমধাম ও মহাসমারোহে নিজেদের সকল আসবাবপত্র এমনকি স্বয়ং নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে এসবের দরজা, চৌকাঠ এবং কাঠ পর্যন্ত খুলে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যায়। আরও লেখা আছে, এরা মদীনা থেকে এমন উৎসবমুখর পরিবেশে ও জাঁকজমকের সাথে গানবাজনা করতে করতে যাত্রা করে যেভাবে একটি বরযাত্রী যাত্রা

করে থাকে। যদিও তাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি অর্থাৎ বাগান ইত্যাদি মুসলমানদের হস্তগত হয় আর যেহেতু কোনো প্রকার প্রথাগত যুদ্ধ ছাড়াই এই সম্পদ অর্জিত হয়েছিল তাই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এর বণ্টনের অধিকার একমাত্র মহানবী (সা.)-এর হাতেই ছিল। আর তিনি (সা.) এই সম্পদের অধিকাংশ দরিদ্র মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন যাদের জীবিকা নির্বাহের ভার তখনো পর্যন্ত সেই প্রারম্ভিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অধীনে আনসারের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল আর এভাবে পরোক্ষভাবে আনসারও সেই মালে গনিমতের অংশীদার হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাহাবীর তত্ত্বাবধানে বনু নযীর (গোত্র) যখন মদীনা থেকে বের হচ্ছিল তখন কতক আনসার সেসব লোকদেরকে তাদের সাথে যেতে বাধা দিতে চায় যারা প্রকৃতপক্ষে আনসারের সন্তান ছিল, কিন্তু আনসারের মানত পূরণ করতে গিয়ে তারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল আর বনু নযীর তাদেরকে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আর আনসারের এই দাবি যেহেতু ইসলামী নির্দেশনা,

??????????????????অর্থাৎ ধর্মে র ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়- এর বিরুদ্ধে ছিল, তাই মহানবী (সা.) মু সলমানদের বিপক্ষে এবং ইহুদীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ইহুদী এবং নির্বাসিত হতে চায় আমরা তাকে আটকাতে পারি না। তবে বনু নযীরের দুজন ব্যক্তি স্বয়ং নিজেদের ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে যায়, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু নযীরের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, তারা যেন সিরিয়া অভিমুখে চলে যায়, অর্থাৎ আরবে না থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কোনো কোনো নেতা, উদাহরণস্বরূপ সালাম বিন আবিল হুকায়েক, কিনানা বিন রবী' এবং হুয়ী বিন আখতাব প্রমুখ এবং আমজনতার একাংশও হিজাযের উত্তরে ইহুদীদের বিখ্যাত বসতি খায়বারে গিয়ে পুনর্বাসিত হয় আর খায়বারবাসীরাও তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং আদরআপ্যায়ন করে। অবশেষে এই লোকেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ানক নৈরাজ্য সৃষ্টি ও যুদ্ধের প্ররোচনার কারণ হয়। "

(সীরাত খাতামান্নবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ.পৃ: ৫২৭)

বনু নযীরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে 'মালে ফ্যায়' বলা হয়। এর বণ্টন কীভাবে হয়েছিল- এ সম্পর্কে লেখা আছে: বনু নযীর গোত্র নির্বাসিত হবার পর তাদের অস্ত্রশস্ত্র, বাগান, জায়গাজমি এবং বাড়িঘর মহানবী (সা.) হস্তগত করেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টি শিরস্ত্রাণ, ২৫টি বর্ম এবং ৩৪০টি তরবারি। এটি ছিল মুসলমানদের অর্জিত প্রথম মালে ফ্যায়। মালে ফ্যায় এমন সম্পদকে বলা হয় যা কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়া কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। এই (মালে ফ্যায়) থেকে মালে গনিমতের ন্যায় খুমুস (তথা এক-পঞ্চমাংশ) পৃথক করা হয় না, বরং সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর অধীনে থাকত যাতে মহানবী (সা.) যেখানে খুশি তা ব্যয় করতে পারেন।বনু নযীরের সাথে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে নি। বরং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর প্রতাপ ও প্রভাব তাদের হৃদয়ে বিস্তার করে দিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলকে তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সম্পদ ছিল মালে ফ্যায়। মহানবী (সা.) তাদের সকল সহায়-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেন যেন তারা সেগুলো পুণ্যকর্মে ব্যয় করতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَمَآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(সূরা আল-হাশর: ০৭) অর্থাৎ আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে নিজ রসূলকে গনিমত হিসেবে যা দান করেছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াওনি, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ রসূলগণকে যার ওপর চান, আধিপত্য দান করেন [অর্থাৎ কোনো যুদ্ধ হয় নি] এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে, যা তিনি চান, সর্বশক্তিমান।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৯-১৯০]

আনসারের অদ্ভুত ঈর্ষণীয় ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও এখানে আমরা দেখতে পাই। মহানবী (সা.) এই মালে ফ্যায় বিতরণ করার সময় হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শামাস (রা.)-কে বলেন, আমার সামনে তোমার জাতিকে একত্রিত করো। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খাযরাজ গোত্রের লোক? তিনি (সা.) বলেন, সকল আনসারকে ডেকে আনো। তখন তিনি (রা.) তাঁর সম্মু খে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের সকল আনসারকে ডেকে আনেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর মুহাজিরদের সাথে আনসারের উত্তম আচরণের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, [অর্থাৎ মুহাজিরদের সাথে আনসার যে উত্তম আচরণ করেছিল- এর উল্লেখ করেন] আর বলেন, যদি তোমরা চাও [অর্থাৎ আনসারের উদ্দেশ্যে বলেন,] যদি তোমরা চাও তাহলে বনু নযীরের কাছ থেকে অর্জিত মালে ফ্যায় তোমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এমতাবস্থায় মুহাজিরদের তোমাদের ঘরের দখল বহাল থাকবে এবং তারা তোমাদের সম্পদের অধিকারী থাকবে। আর তোমরা সম্মতি দিলে আমি মালে ফ্যায় মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করতে চাই। এর ফলে তারা তোমাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাড়িঘর থেকে বের হয়ে যাবে। [অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে সম্পদ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং মুহাজিররা আনসারের সম্পত্তি থেকে যে উপকার লাভ করছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা তখন তাদের কাছে সহায়-সম্পদ থাকবে।] এই কথার প্রেক্ষিতে হযরত সা'দ বিন উবাদা ও হযরত সা'দ বিন মুআয(রা.) নিবেদন করেন, আমাদের সম্পত্তিও তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদও আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বিতরণ করে দিন। [অর্থাৎ আমরা তাদেরকে যে সম্পদ দিয়ে রেখেছি সেটা তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত মালে ফ্যায়ও তাদেরকে দিয়ে দিন।] মুহাজিররা চতুর্দিক থেকে আনসারের এই আওয়াজ শুনতে পেল: 'রাযিনা ওয়া সাল্লামনা ইয়া রসূলাল্লাহ্!' অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট এবং আমরা এতে সম্মতি দিচ্ছি।

মহানবী (সা.) ত্যাগের এই স্পৃহা দেখে খুবই প্রীত হন এবং বলেন, 'আল্লাহুম্মারহামিল আনসারা ওয়া আবনাআল আনসার', অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আনসার এবং তাদের সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো।

মহানবী (সা.) অধিকাংশ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করে দেন। আনসারের মধ্য থেকে কেবল দুজন অভাবী সাহাবীকে উক্ত সম্পদের অংশবিশেষ দেওয়া হয় যারা ছিলেন যথাক্রমে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ এবং হযরত আবু দুজানা (রা.)। ইবনে উয়ায়না বর্ণনা করেন, আমি যু হরীকে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বনু নযীরের সম্পদ থেকে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং হযরত আবু দুজানা (রা.) ব্যতীত আনসারের মধ্য থেকে আর কাউকে এর অংশ দেন নি। এ দুজন সাহাবী যেহেতু অভাবী ছিলেন তাই তাদেরকে (উক্ত সম্পদের) অংশ দেওয়া হয়।

মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)-কে আবু হুকায়েকের তরবারিটি প্রদান করেন। এই তরবারির বিশেষ খ্যাতি ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩২৫)

মহানবী (সা.) অবশিষ্ট জিনিসপত্র দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেন। আর কিছু নিজের জন্য রাখেন যা (তাঁর) পবিত্র সহধর্মিনীদের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু নযীরের এসব বাগান থেকে প্রাপ্ত শস্যাদির মধ্য থেকে এক বছরের ব্যয়ের সমপরিমাণ তাঁর স্ত্রীদের প্রদান করতেন। অর্থাৎ তাদের যে বার্ষিক ব্যয় ছিল তা নিজ স্ত্রীদের দিতেন। আর যা অবশিষ্ট থাকত তা জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্যও এই অর্থ থেকে করা হতো। বনু নযীরের সাতটি বাগান ছিল যেগুলো দেখাশোনার জন্য মুক্ত ক্রীতদাস হযরত আবু রাফে'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তিনি (বাগানগুলোর) ম্যানেজার ছিলেন। এসব বাগানের নাম ছিল যথাক্রমে- মিস'আব, সাফিয়া, দিলাল, হুসনা, বুরকা, আওয়াফ ও মাশরাবা উম্মে ইবরাহীম।

[দায়েরায়ে মারেফ সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.), ৭ম খণ্ড, পৃ: ১৮৯-১৯১]

যাহোক, এখানে বনু নযীরের যুদ্ধের বর্ণনা সমাপ্ত হচ্ছে। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য যুদ্ধের বর্ণনা করা হবে।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ারত থাকুন। আল্লাহ তা'লা সেখানকার সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায়উন্নতি দিন আর আহমদীদের নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখুন।

সারা বিশ্বের মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন। তারাও যেন যুগ-ইমামকে মান্য করে নিজেদের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। পৃথিবীতে যুদ্ধের যে সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর পরিস্থি তি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা দেখে এখন তো মনে হচ্ছে, যুদ্ধ হবেই হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক আহমদী ও প্রত্যেক নিষ্পাপকে যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখুন। (আমীন)

*** সমাপ্ত ***

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে মহানবী (সা.)-এর গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান বায়তুল্লাহ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যের সাথে

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহে.)

আল্লাহ্ তা'লাই গোটা মানবজাতির মঙ্গালের জন্য এক ঘর বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল দাঁড়ালো এই যে- সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমনকি এর নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা সেই গৃহের 'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন' নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে নবরূপে একে পুণরায় নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে ওই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় লেগে রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পুর্ণরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হলো আর বিশ্বজোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকেরক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা এবং সূরা আলে ইমরান, ৯৭-৯৮ ও আল বাকারার ১২৬-১৩০ আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর হুযূর (রাহে.) বলেন, একান্তই জরুরী এক বিষয়ের উপর আমি মাত্র একটি খুতবা প্রদান করেছিলাম যার সংক্ষিপ্ত সার হলো-আল্লাহ্ তা'লাই গোটা মানবজাতির মঙ্গালের জন্য এক ঘর বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা এর বিশালত্বকে শনাক্ত করতে পারে নাই। ফল দাঁড়ালো এই যে- সে ঘর নষ্ট হয়ে গেল এমনকি এর নাম-নিশানা পর্যন্ত মুছে গেল। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহপূর্ণ বাণী দ্বারা সেই গৃহের 'ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন' নির্দেশিত করে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে নবরূপে একে পুণরায় নির্মাণ করালেন আর এর সুরক্ষার জন্য ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য এ ব্যবস্থা করিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজ সন্তানকে ওই পবিত্র গৃহের জন্য উৎসর্গ করেন। এভাবে তার (আ.) বংশধরেরা এক সুদীর্ঘকাল এর সেবায় লেগে রইলো। দু'হাজার পাঁচশ' বছর ধরে সেবা ও দোয়ার ফলশ্রুতিতে সেই জাতি পুর্ণরূপে পরিপক্কতা প্রাপ্ত হলো আর বিশ্বজোড়া সার্বজনীন শরীয়তের দায়িত্বসমূহকে অসহায়ত্বের কবল থেকে রক্ষা করার শক্তি ও যোগ্যতা নিজ মাঝে ধারণ করলো।

আমি আরও বলেছিলাম- এ আয়াতে যা আমি তেলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্ তা'লা ওই তেইশটি মহান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যার সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সাথে রয়েছে আর ওই যাবতীয় লক্ষ্যের অর্জন নবী করীম (স.)-এর আবির্ভাবের সাথে সম্পৃক্ত। ওই উদ্দেশ্যাবলী থেকে পাঁচটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি গত খুতবায়- আপনারা, যারা আমার প্রিয়জন তাদের সামনে স্বীয় ধ্যানধারণা ও উপলব্ধি বর্ণনা করেছি। প্রথমত- এটা সেই ঘর উযিআ' লিন্নাস, গোটা মানবজাতির কল্যাণার্থে যা নির্মাণ করা হচ্ছে, দ্বিতীয়ত মুবারাকান-এর মাঝে 'মুবারক' (কল্যাণমন্ডিত) হওয়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়- বাহ্যিকভাবেও আর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণেও, তৃতীয়ত- হুদাল্লিল আ'লামীন সমগ্র জগতের জন্য আমরা একে হেদায়াত-এর কারণ ও উৎসস্থল বানাতে চাই, আর জীবন চলার পথে হেদায়াত-এর অন্তর্নিহিত সব অর্থে একে আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বজগতের জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানিয়েছেন।

চতুর্থত এই যে, ফিহে আয়াতিম বায়্যিনাতঅর্থাৎ ঐশী নিদর্শনাবলীর এমন ধারাবাহিকতা এস্থান থেকে জারী রাখা হবে যা কিয়ামত কাল পর্যন্ত সজীব থাকবে আর ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের এমন ফল্গুধারা উৎসারিত হবে যা কখনও নিঃশেষিত হবে না। আর পঞ্চমত মাক্বামুইব্রাহীম বাক্যাংশ প্রকাশ করছে যে ওই ইবাদত যা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা ও মায়ামমতার ভিতের উপর গড়ে তোলা হবে, সেই ইবাদতের কেন্দ্রভূমি হবে এটি, আর ভবিষ্যতে সকল যুগের সকল জাতির প্রতিনিধিত্বশীল এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটানো হবে যারা হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ন্যায় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে পাপমুক্ত হয়ে তাঁর (আল্লাহ্ তা'লার) ভালোবাসায় মস্তকাবনত হয়ে থাকবে আর আল্লাহ তা'লার নৈকট্যপূর্ণ সান্নিধ্য লাভের দুয়ার তাদের জন্য চিরতরে উন্মুক্ত করে রাখা হবে।

এই পাঁচটি উদ্দেশ্য- যেগুলো সম্পর্কে আমি গত জুমুআর খুতবায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলাম। কারণ আমাকে ওই উদ্দেশ্যসমূহের প্রত্যেকটির বিষয়ে পুনর্বার আলোচনায় আসতে হবে, এটা সাব্যস্ত করার জন্য যে ওর প্রত্যেকটিরই সম্পর্ক রয়েছে নবী করীম (সা.) এর আবির্ভাবের সাথে, আর সেই সাথে এটাও উল্লেখ করতে যে, সেই উদ্দেশ্য কীভাবে আর কেমন উচ্চ মর্যাদার সাথে অর্জিত হয়েছে। এজন্য আমার ইচ্ছা আজ এই যে, সংক্ষিপ্তভাবে আমি সেই উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করি; আর চেষ্টা করবো ঐ তেইশটি উদ্দেশ্যের মধ্যে যেগুলোর বর্ণনা অবশিষ্ট রয়ে গেছে সেগুলো আজকের খুতবায় বর্ণনা করে দেবার, যতটা আল্লাহ্ তা'লা চান।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ওয়ামান দাখালাহূকানা আমিনান এটা হল বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য। যে কেউ এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঐরূপ ইবাদত করবে বায়তুল্লাহ্র সাথে যার সম্পর্ক, সে ইহজগতের ও পরকালের জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ পেয়ে খোদার নিরাপদ আশ্রয়ে এসে যাবে এবং তার অতীতের সব গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতএব বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের ষষ্ঠ উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্ তা'লার আরাধনায় এমন এক গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া যার সাথে অন্যান্য ইবাদতকর্মও সম্পর্ক রাখে। আর যে কেউই একাগ্রতাপূর্ণ ইচ্ছার সাথে পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণরূপে আরাধনা করবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি এখানে এই ব্যক্ত হয়েছে যে, তাদের পূর্ববর্তী যাবতীয় পাপসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে আর দোযখের আগুন থেকে তারা সুরক্ষা লাভ করবে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সপ্তম উদ্দেশ্য- আল্লাহ্ তা'লা এখানে এটা জানিয়েছেন যে ওয়া লিল্লাহি আলান্নাসি হিজ্জুল বায়তি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর বংশধর কিংবা কেবল আরববাসীদের উপরই এটা ফরয নয় যে তারা বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করুক বরং বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটা যে জগতের সবজাতি বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করার জন্য এই পবিত্র ভূমিতে সমবেত হোক (আমি মনে করি, এসব উদ্দেশ্য হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের সময়েই জানিয়ে দেয়া হয়েছিল। কুরআন করীমে কুরাইশ জাতির কর্মোদ্দীপনার ব্যাপারে যেমনটা উল্লেখ পাওয়া যায়)।

যাহোক, আল্লাহ্ তা'লাই হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে জানিয়েছেন এটা এমন একটি ঘর যে বিশ্বের সব জাতি যারা আমার উপর ঈমান আনবে আমার রসূল (সা.)-এর উপরও ঈমান রাখবে এবং খাতামান্নবাবীঈন (সা.) এর হাতে হাত রেখে আমার আনুগত্যের জোয়াল নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে, তাদের জন্য বায়তুল্লাহ্র হজ্জ ফরযরূপে (বাধ্যতামূলক) নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর এভাবে সেই স্থানকে সৃষ্টির প্রত্যাবর্তনস্থল এবং জগতের কেন্দ্রস্থলে পরিণত করে দেওয়া হবে।

অষ্টম উদ্দেশ্য- অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের অষ্টম উদ্দেশ্যরূপে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল মাসাবাতান (বার বার মিলিত হওয়ার স্থান)-এই শব্দে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে বিশ্বের জাতিগুলো দলে উপদলে বিভক্ত হবে পড়বে আর যে যুগে এই বিভক্তি চরমরূপ ধারণ করবে সে যুগে এমন এক রসূল প্রেরিত হবেন যিনি বায়তুল্লাহ্র এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণতাদানকারী হবেন আর বিভাজিত জাতিসমূহ, দল ও উপদলগুলোকে একই কেন্দ্রে এনে একতাবদ্ধ করবেন। তিনি সবাইকে আলা দিনিওঁ ওয়াহিদিন-এ নিয়ে আসবেন। অতএব এখানে ব্যক্ত হয়েছে যে একযুগে বিভাজন যখন চরমে পৌঁছে যাবে তখন আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা এটাই যে সেই যুগে এমন এক রসূল পাঠান যিনি সব জাতিকে উম্মাতাওঁ ওয়াহিদাতুন বানিয়ে দেন।

নবম উদ্দেশ্য আমনান বলা হয়েছে- এটা অর্থাৎ এটাই হলো সেই ঘর যা আমনান লিন্নাস- এখানে এর অর্থ হল, আমরাই নিজেদের এই ঘরকে এমন বানাতে চেয়েছিলাম যে, এর মাধ্যমে এবং শুধুএরই দ্বারা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য লাভ হবে। কারণ কেবল এটিই এক ঘর যাকে বায়তুল্লাহ্ আখ্যায়িত করা যায়, একে পরিত্যাগ করে এর শিক্ষাকে অবমূল্যায়ন করে যার সম্পর্ক এই ঘরের সাথে রয়েছে, বিশ্বের যে কোন সংস্থা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে দেখে নিক, তারা কখনই এতে সফল হবে না। বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা কেবল সে সময় আর কেবলমাত্র সেই শিক্ষার উপরই আমল করার ফলে লাভ হতে পারে, যে শিক্ষা

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মমালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

সেই মহান নবী জগতসমক্ষে উপস্থাপন করবেন যাঁর উত্থান ঘটানো হবে পবিত্র কাবাগৃহ থেকেই।

আমান-এর অপর এক মর্মার্থানুযায়ী আমনান লিন্নাস-এর অর্থ এটাও যে, আধ্যাত্মিকভাবে জগদ্বাসীর অন্তরের স্বস্তি শুধুই পবিত্র মক্কা আর শুধুসেই শেষ শরীয়তের সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করার ফলে অর্জিত হতে পারে যা শেষ শরীয়ত মক্কায় প্রকাশিত হবে আর বিশ্বের সকল জাতিকে ডেকে ডেকে তাদেও নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান করতে থাকবে।

আর যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরের স্বস্তি ঐ সময়ে লাভ হতে পারে, যখন তার স্বভাবজ ও প্রকৃতিগত চাহিদাগুলোকে সেই সুশিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে নিতে সক্ষম হয় আর আল্লাহ্ তা'লা মানুষের মাঝে যত রকম শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন সেগুলোর লালন-পালন ও পরিপোষণ করতে সমর্থ হয়, অর্থাৎ শিক্ষাদানের একটাই ঘর হবে- মক্কা, যা সত্যিকারভাবে জগতের অন্তরে স্বস্তিদানকারী অর্থাৎ উভয় অর্থ এখানে প্রযোজ্য হয়- এক তো হল, শান্তি ও নিরাপত্তার সৌভাগ্য যদি বিশ্ব পেতে চায় তবে তা মক্কার বদৌলতে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববাসী যদি অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে চায়, নিরুদ্বেগ ও উৎকণ্ঠামুক্ত বিশ্ব পেতে চায় তাহলে তাও কেবল ঐ পবিত্র শিক্ষা লাভের ফলেই সম্ভব, যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কাবা গৃহ নির্মাণের দশম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন ইত্তাখিযুমিম মাক্বামি ইব্রাহিমা মুসোয়াল্লা। পূর্বের এক আয়াতে মাকামু ইব্রাহীম-এর উল্লেখ পাওয়া যায় আর তা থেকে বুঝা যায় যে, এই আবাসস্থল এমন এক গহ্, যে স্থানে সত্য ও চিরন্তন ইবাদতের ভিত্তি রাখা হয়েছিল, পরম উপাস্যের সাথে গভীর ভলোবাসা আর প্রেমাস্পদের প্রতি বিনীত আত্মসমর্পণের ঝর্ণা থেকে যা উৎসারিত। ওয়াত্তাখিযুমিম্ মাক্বামি ইব্রাহীমা মুছোয়াল্লা'-য় ইবাদতের সেই উল্লেখ রয়েছে যা অনুতাপ আর বিনয় থেকে উৎপত্তি লাভ করে প্রকাশিত হয়। আসলে, আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন যে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এক উদ্দেশ্য- এমন এক জাতির জন্ম দেয়া, লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েও যারা বিনয়ের সাথে নিজেদের প্রভুপ্রতিপালকের সমীপে বিনীত ইবাদতের দিক থেকে হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আদর্শের প্রতিচ্ছবি প্রতিষ্ঠাকারী হবে এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্রসমূহকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের একাদশতম উদ্দেশ্য-বর্ণিত হয়েছে, ত্বাহ্হিরা বায়তিয়া আর এতে আমাদের শিখানো হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লার এটা পরিকল্পনা যে বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিতে পবিত্র এই কাবাগৃহ শিক্ষালয়স্বরূপ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গোটা দুনিয়ার জন্য একে শিক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কাবাগৃহ নির্মাণের দ্বাদশতম উদ্দেশ্য- ব্যক্ত করা হয়েছে লিত্ত্বাইফীনা অর্থাৎ জাতিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ বার বার এখানে এসে সমবেত হতে থাকবে। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই সংবাদ দিয়েছিলেন যে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতিনিধিরা বার বার এখানে তওয়াফ করতে আসতে থাকবে, আর সেই সব উদ্দেশ্যকে পুরা করার জন্যও আসবে যেগুলো পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পর্ক রাখে।

ত্রয়োদশ উদ্দেশ্য- বর্ণনা করা হয়েছে ওয়াল আ'কিফীনা। এ উদ্দেশ্যের কারণেই পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে নির্মাণ করা হচ্ছে যে, এর মাধ্যমে এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা নিজেদের জীবন খোদা তা'লার পথে উৎসর্গকারী হয়ে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণের উদ্দেশ্য পূর্ণকারীও হবে।

চতুর্দম উদ্দেশ্য- এখানে এটাই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা চাচ্ছেন ওয়ার্‌রুক্কাই'স্ সুজুদ এমন এক জাতি সৃষ্টি করা হোক যারা মহান সৃষ্টিকর্তার একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য ও নির্দেশ মান্যকারী হয়ে নিজ জীবন কাটিয়ে দেয়।

পঞ্চদশ উদ্দেশ্য- বর্ণিত হয়েছে বালাদান আমিনান। আমান শব্দটি এই আয়াতে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এই ঘরকে দুনিয়ার অত্যাচারমূলক আক্রমণ থেকে স্বীয় নিরাপত্তামূলক আশ্রয়ে রাখবো আর এমন কোন হামলা যা পবিত্র কাবা গৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে করা হবে তাতে তারা সফলকাম হবে না বরং আক্রমণকারীদের এমনভাবে ধ্বংস করা হবে যে তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে যাতে এ থেকে জগত এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে সেই নবী- যাকে আমরা এখানে আবির্ভূত করতে চাই সে-ও খোদা তা'লার নিরাপদ আশ্রয়েই থাকবে আর জগতের কোন শক্তি তাকে (নবীকে) বধ করতে বা তার মিশনকে নিষ্ফল করতে সক্ষম হবে না আর এ থেকে জগত এই শিক্ষা লাভ করবে যে নিষ্পাপ নবীকে যে শরীয়ত দেওয়া হয় তা চিরন্তনরূপেই তাকে দেয়া হয় আর তার হেফাযতের দায়িত্বে স্বয়ং খোদা তা'লাই থাকেন।

ষোড়শ উদ্দেশ্য যা পবিত্র কাবাগৃহের সাথে সম্পৃক্ত তা হল ওযারযুক্ আহ্লাহুমিনাস সামারাতি। এখানে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, নবরূপে আমি বায়তুল্লাহ্কে পূণর্নির্মাণ করাচ্ছি এ উদ্দেশ্যে যে, বায়তুল্লাহ্ ও বায়তুল্লাহ্র কল্যাণসমূহ দর্শন করে জগত যাতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে খোদা তা'লার পথে যে সব লোকেরা মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁরই হয়ে তাঁরই রাস্তায় কুরবানী দিতে থাকে আর পার্থিবতা থেকে মুক্ত হয়ে কেবল তাঁরই জন্য নিবেদিত হয়ে যায় তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট হয় না বরং প্রেমাস্পদের দেয়া মিষ্টিমধুর ফল তাদের লাভ হয় আর বিনম্র প্রেমানুরাগপূর্ণ আমলের সর্বোত্তম ফল-লাভ তাদের জন্য অবধারিত এক নিয়তিতে পরিণত হয়।

বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার সপ্তদশ উদ্দেশ্য-জানানো হয়েছে রাব্বানা তাক্কাব্বাল মিন্নাবায়তুল্লাহ্ নির্মাণের এটি অন্যতম উদ্দেশ্য, জগত যাতে জানতে পারে আর উপলব্ধি করতে পারে যে দোয়ার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লাভ করা সম্ভব। দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে মানুষ আত্মবিলীনতা লাভ করে মৃতের ন্যায় হয়ে গেলে আকাশ থেকে ঐশী অনুগ্রহের অবতরণ ঘটে আর নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞান লাভের পথসমূহ বান্দার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ আয়াতের এ অংশেও আল্লাহ্ তা'লা বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যে- এই স্থানে (মক্কায়) এমন এক জাতির উদ্ভব হবে যারা যাবতীয় শর্তাবলী পালন করা সহ দোয়াকারী হবে। দোয়ায় নিমগ্ন হয়ে তারা 'মৃত-সদৃশ' এক অবস্থায় নিজ সত্ত্বা পরিপূর্ণরূপে হারিয়ে বিগলিত এক ধারায় প্রভু-প্রতিপালকের আস্তানায় বয়ে চলবে আর তারা উপলব্ধি করবে যে আমরা নিজেদের আমলের ফল হিসাবে (প্রকৃতপক্ষে ফল হিসাবে নয়) কিছুই অর্জন করতে সক্ষম নই যতক্ষণ আমরা দোয়ার দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণ না করছি। তাঁর জন্য অসাধারণ কুরবানীসমূহ দেয়ার পরও তারা নিজেদের কুরবানীসমূহকে সামান্যতম মূল্যবান কোন কিছু মনে করে না বরং সর্বক্ষণ নিজেদের প্রভু-প্রতিপালকের সমীপে সম্পূর্ণরূপে সমর্পিত থাকে আর অগণিত কুরবানী প্রদান করা সত্ত্বেও তাদের দোয়া এটাই হয়ে থাকে যে, 'আমরা তোমার সমীপে যা কিছুনিবেদন করছি তা এক নগণ্য উপহার, তোমার মর্যাদা সুমহান ও সুউচ্চ আর আমরা মনে করি তোমার কাছে আমাদের পেশকৃত এ উপহার গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু সদাশয় তুমি কৃপাকারী প্রভু-প্রতিপালক! আমাদের নগন্য এ উপহার তুমি গ্রহণ কর। আমাদের দূর্বলতাসমূহ, আমাদের মন্দ কার্যসমূহ ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ, দয়া ও মমতার উপকরণ সৃষ্টি কর, যাতে আমরা স্বভাব চরিত্রে আর সাধ্য সাধনায় তোমার কাছে গ্রহণীয় হয়ে যাই', মোট কথা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জাতির উদ্ভব ঘটাতেই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত রেখেছিলেন।

অষ্টাদশ উদ্দেশ্য- আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুণর্নির্মাণের উদ্দেশ্য হল, জগত জানুক- খোদা তা'লার সমীপে যেসব লোকেরা এমনিভাবে দোয়ারত থাকে, নিজ প্রভুপ্রতিপালকের সামিউন গুণের প্রতিফলন তারাই প্রত্যক্ষ করে, জগতও দেখে নেয় যে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক তিনিই, যিনি সর্বশ্রোতা, তিনি আমাদের দোয়াসমূহ শুনেন সেই সাথে এটা জানিয়েও দেন যে আমি তোমাদের দোয়া শুনেছি। এভাবে পবিত্র কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে সর্বশ্রোতা খোদা তা'লার গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভে জগত সক্ষম হবে।

উনবিংশ উদ্দেশ্য- এটা যে, দুনিয়া এর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী খোদা তা'লার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করবে। এমনটি হবে না যে, বান্দা নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে যে দোয়া করে হুবহু সেভাবেই তিনি তা গ্রহণ করে নেন, বরং বান্দা দোয়া করবে এমন ভাবে যে, বিনীত দোয়াকে উচ্চমার্গে পৌঁছে দিলে তার রব্বতার প্রভু-প্রতিপালক তার দোয়া শুনবেন আর কবুল করবেন, তবে তিনি (আল্লাহ্) তা কবুল করবেন অদৃশ্য ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞাতা হিসেবে অর্থাৎ যে রঙে বান্দার ঐ কৃত দোয়াসমূহ কবুল হওয়া উচিত সেইরূপে। কতিপয় দোয়া বাতিল হয়ে যাওয়া অথবা কতিপয় দোয়া ঐরূপে পূর্ণ না হওয়া যে রূপে দোয়া করা হয়েছিল, এটা সাব্যস্ত করে না যে খোদা সামীউন (সর্বশ্রোতা) নন বা ক্বাদীর(সর্বশক্তিমান) নন বরং এটাই সাব্যস্ত করে যে খোদা তা'লাই নিজ সত্ত্বায় আল্লামুল গুয়্যুব (অদৃশ্য ভবিষ্যতের সম্যক জ্ঞাতা)।অতএব পবিত্র কাবাগৃহের ভিত্তি এজন্য রাখা হয়েছে যে খোদা তা'লার বান্দারা আ'লীমখোদার সাথে পরিচিত হোক আর তাঁকে চিনতে থাকুক, তাঁকে জানতে থাকুক, তাঁকে সনাক্ত করতে পারুক।

বিংশ উদ্দেশ্য- বর্ণিত হয়েছে

ওয়া মিন যুর্‌রিয়্যাতিনা উম্মাতাম্ মুসলিমাতাল্‌লাকাঅর্থাৎ উম্মতে মুসলেমাকে আমার বংশধরের মধ্যে থেকে জন্ম দিও। আল্লাহ্ তা'লা এখানে আলোকপাত করেছেন– আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে যুগে জগতের বুকে আবির্ভূত হবেন তখন তাঁর (স.) জাতি উম্মাতাম্ মুসলেমাতান হওয়ার যোগ্যতা ধারণে সক্ষম হবে আর ইব্রাহীম (আ.)-এর দোয়ার ফলে সেই উম্মত উম্মাতাম্ মুসলেমাতান-এ পরিণত হয়ে যাবে।

এর অর্থ এটাও যে ওই নবী যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে সে মক্কায় জন্ম লাভ করবে, তবে তোমরা দোয়ায় রত থাক যে, 'হে খোদা! আমাদের ও আমাদের বংশধরদের দুর্বলতা আর অনীহার ফলে এমনটি যেন না হয়ে যায় যে তোমার দৃষ্টিতে আমরা তাঁর যোগ্য না থাকি, আমাদের সাথে দেওয়া ঐ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ না হয় বরং অন্য কোন জাতিতে ঐ নবী আবির্ভূত হয়ে যায়'। তাই বলেন তুমি আমার বংশধরদের মধ্য থেকে 'উম্মতে মুসলেমা' বানিও। প্রথম সম্বোধনেও রয়েছেন তিনি আর গোটা বিষয় কবুলকারীও তিনি নিজেই।

অতএব, এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, সেই উম্মত যারা হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে জন্ম লাভ করেছে– তারাই হল 'উম্মতে মুসলেমা'। ঐ নবীকে অস্বীকার করো না। ঐ নবীর প্রতি ঈমান এনো– যে সব দায়িত্ব তাঁর (সা.) কাঁধে ন্যস্ত হয় তা পালনের শক্তি সামর্থ্য ও যোগ্যতা তিনি রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন যে আমরা তাদেরকে এমনই জাতিরূপে গড়তে চাই আর এ উদ্দেশ্যেই আমরা পবিত্র কাবাগৃহ নবরূপে পুনর্নির্মাণ করিয়েছি।

একবিংশ উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে আরিনা মানাসিকানা। এতে এ ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সম্মানিত স্থান মক্কা থেকে এমন এক রসূল (স.) জন্ম লাভ করবেন যিনি জগতের বুকে ঐ যুগে আগমন করবেন যখন তিনি নিজের আধ্যাত্মিক ও দৈহিক পরিপোষণের পর এমন এক মর্যাদায় পৌঁছে যাবেন যে সম্পূর্ণ ও পরিপূর্ণ শরীয়তের তিনি ধারকে পরিণত হবেন। এমন শরীয়ত যা পূর্ববর্তী ধর্মবিধানগুলোর তুলনায় অত্যুজ্জ্বল, সেই শরীয়ত এমনই যার মাঝে সময়োপযোগী আমল করার শিক্ষা দান করা হয়েছে এবং এমন শরীয়ত যা প্রত্যেক জাতির সর্বকালের প্রয়োজনসমূহ ও চাহিদাগুলোকে পূর্ণতা দানকারী। আরিনা মানাসিকানা আমাদের যুগোপযোগী যেসব কাজকর্ম, যেসব ইবাদত বন্দেগী আর যেসব দায়-দায়িত্ব রয়েছে সেসব আমাদের দেখিয়ে দাও আর শিখিয়ে দাও। অর্থাৎ কুরআনের শরীয়ত বিধি-বিধান আমাদের প্রতি অবতীর্ণ কর।

এভাবে আরিনা মানাসিকানায় এটা ব্যক্ত হয়েছে যে, ঐ রসূল যখন আসবেন বিশ্বের সকল জাতিসমূহের সাথে তার যোগাযোগ হবে আর তেমনিভাবে সর্বযুগের সাথেও যোগসূত্র হবে । অতএব দোয়ায় রত থাক– হে আমাদের 'রব্ব' বিভিন্ন জাতির চাহিদা ও আচার-আচরণে পার্থক্য রয়েছে, বিভিন্ন যুগের চাহিদাতেও তারতম্য রয়েছে, এসব দৃষ্টিপটে রেখে এমন পূর্ণাঙ্গীন ও পরিপূর্ণ শরীয়ত অবতীর্ণ কর যা সকল জাতির প্রকৃতিগত চাহিদাকে পূরণকারী হয় আর সর্বযুগের সমস্যা ও সঙ্কটের সমাধানকারী হয় এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে, যাতে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কাবাগৃহের ভিত যে উদ্দেশ্যে রেখেছেন তা পূর্ণতা লাভ করে।

দ্বাবিংশ উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা ব্যক্ত করেছেন ওয়াতুব্ আলাইনা। এতে নির্দেশ করা হয়েছে, শেষ শরীয়ত যা এখানে অবতীর্ণ করা হবে তার খুবই গভীর সম্পর্ক হবে রাব্বে তাওয়াব-এর সাথে, আর ঐ শরীয়তের অনুসরণকারীরা গভীর সেই মর্ম শনাক্তকারী হবে যে, অনুশোচনা (তাওবা) ও ক্ষমা (মাগফিরাত) ছাড়া তত্ত্বজ্ঞান (মারেফাত) অর্জন সম্ভব নয়, এ জন্য সে বার বার তাঁর (আল্লাহ্‌র) পথে কুরবানীদাতা হতেই থাকবে আর বারে বারে তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী হতে থাকবে সেই সাথে বলবে, হে খোদা! আমার ত্রুটিসমূহ ক্ষমা কর।

ঐ জাতি এমনই হবে, যারা পুণ্যকর্ম করার পরও ঐ বিষয়ে ভয় পেতে থাকবে যে, পুণ্যকর্মের কোনটা আমাদের বাদ পড়ে যায়নি তো! যার কারণে আমাদের 'রব্ব' আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতে পারেন। তারা হবে ইস্তেগফার (অনুতাপ) ও তওবায় (অনুশোচনায়) সর্বক্ষণ নিমগ্ন এক জাতি ।

ত্রয়োবিংশ উদ্দেশ্য– আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন রাব্বানা ওয়াব্‌আস ফিহিম রাসুলাম্ মিনহুমঅর্থাৎ আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর জন্মভূমি ঐ স্থানকে নির্ধারণ করতে চাই, আমরা ঐ স্থানকে এমন মর্যাদা দিতে চাই যে, যার অভ্যন্তরে অনুনয় বিনয় ও কাকুতি মিনতির সাথে আর বিনম্র কোমলতার সাথে প্রেম প্রীতি ভালোবাসার সাথে কৃত দোয়ার ফলশ্রুতিতে আমরা স্বীয় এক দাসকে মুহাম্মদীয়ত (প্রশংসিত)-এর মর্যাদাবান অবস্থানে দন্ডায়মান করবো, আর তার মাধ্যমে এমন এক শরীয়ত প্রতিষ্ঠিত হবে আর এমন এক উম্মতের উদ্ভব ঘটানো হবে যারা নিজেদের মাঝে জীবন্ত নিদর্শন ধারণ করবে ইয়াতলূআলাইহিম আয়াতিকা আর জীবন্ত খোদার সাথে ও জীবন্ত রসূলের সাথে ও জীবিত শরীয়তের সাথে তাদের সম্পর্ক হবে। পূর্ণাঙ্গ শরীয়তের শিক্ষা তাদেরকে দান করা হবে, তবে অবুঝ শিশুদের যেভাবে বলা হয় তাদেরকে সেভাবে বলা হবে না যে, আমরা বলছি আর তোমরা মেনে নাও।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের জ্ঞান বুদ্ধি ও মেধাকে সতেজ করতে স্বীয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশাবলীও ঐ নবীর মাধ্যমে তাদেরকে জানাবেন আর এভাবে তাদেরকে এতটা পবিত্র করে দেওয়া হবে যে সে ধরণের পবিত্রতালাভ পূর্ববর্তী কোন জাতির ক্ষেত্রেই ঘটে নি আর এটা এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা আমাদেও জ্ঞানবুদ্ধিও সাগ্রহে মেনে নেয়। কেননা পূর্ববর্তী প্রায় সব উম্মতের প্রতি অসম্পূর্ণ শরীয়তের অবতরণ হয় আর সেই অপূর্ণ পথ-নির্দেশনার কারণে তাদেও আত্মশুদ্ধি যদি কিছু হয়েও থাকে তাহলে ঐ আত্মশুদ্ধিও পূর্ণাঙ্গীন নয়। তা ছিল তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও ক্ষমতা অনুযায়ী; তবে তা পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধিমূলক পর্যায়ের ছিল না।

যেহেতুযে শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়েছে তা পূর্ণাঙ্গীন নয় কেননা তাদের চেতনাবোধ ও সামর্থ্যও পূর্ণাঙ্গীন নয় সেই জন্য সেই জাতির উদ্ভব যখন হল যারা পূর্ণাঙ্গীন শরীয়তের ধারক হওয়ার সামর্থ্য রাখতো, তখন তাদের মধ্য থেকে যেসব লোকেরা অসাধারণ কুরবানীসমূহ পেশ করে খোদা তা'লার ভয় রেখে তাঁর যাবতীয় নির্দেশাবলী পালন করে ও সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে আত্মরক্ষা কওে তাঁর সমীপে কাকুতি মিনতির সাথে নিজ জীবন এমনভাবে অতিবাহিত করে যেন তার আত্মশুদ্ধি লাভ হয় (অবশ্য খোদা তা'লার অনুগ্রহের কারণেই এরূপ হয় নতুবা এটা তার আমলের ফল নয়), সেইটি হবে এক পূর্ণাঙ্গীন আত্মশুদ্ধি। তদ্রূপ এক পাকপবিত্রতাও লাভ হবে তার। আল্লাহ্ তা'লা তাতে এতটাই সম্মত ও সন্তুষ্ট হোন যে ঐরূপ সন্তুষ্টি পূর্ববর্তী জাতিসমূহ অর্জন করতে পারে নি।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলছেন, বায়তুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এক খায়রুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকেপৃথিবীর বুকে আবির্ভূত করা আর পরবতীতে মানবজাতিকে মর্যাদার উচ্চস্তরে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠিত করা, উন্নতির যে শিখরে দাঁড় করানোর উদ্দেশ্যে আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে আমাদের বিনীত দোয়া, তিনি আমাদেরকে সর্বদা নিজ অনুগ্রহে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন। আমরা তো অত্যন্ত দুর্বল ও অযোগ্য আর অনিষ্টকারী ও পাপী এবং অবুঝ আর স্থুল বাসনা-কামনায় পরিবেষ্টিত হয়ে আছি, তবে তিনি যদি চান আর তাঁর অনুগ্রহ ও আশিস আমাদের প্রতি বর্ষিত হয় তাহলে সব রকমের নোংরামি ও মন্দ থেকে তিনি আমাদেও উদ্ধার করে পবিত্রতার ঐ উন্নত স্তরে পৌঁছাতে পারেন যার প্রতিশ্রুতি তিনি উম্মতে মুসলেমাকে দিয়েছেন।

পরবর্তী খুতবাগুলোতে ইনশাআল্লাহ্ আমি ঐ তেইশ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নবী করীম (স.)-এর মাধ্যমে কীভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে তার বিশদ বর্ণনা দিব। আমি ধীরে ধীরে আপনাদেরকে সেই বিষয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছি, যে সম্পর্কে আমি পূর্বেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে মহান এক উদ্দেশ্যের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আমার মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়েছেন আর সবাইকে একত্রিত করে সংশোধন করতে সেই কর্মসূচী বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

যাহোক, আমি চেষ্টা করছি আপনাদেরকে জ্ঞানগত ও মেধাগত দিক থেকে প্রস্তুত করতে। তবে আমি কে– আর আমার বলায় কীই-বা এলো গেল– যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে আমার কথাতে প্রভাব সৃষ্টি না করছেন আর আপনাদের অন্তরকে সেই কথার প্রভাব গ্রহণ করার সামর্থ্য দান না করছেন, এজন্য আপনারা দোয়ায় রত থাকুন।

আমিও দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহ ও আশিসে আমাদের জামা'ত দ্বারা সেই কর্ম সাধন করান, যে মহান কর্ম সাধিত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তা'লা সেই পবিত্র গৃহ (কাবা) নির্মাণ করেছেন। (আমীন!)

(বায়তুল্লাহ শরীফ নির্মাণের তেইশটি মহান উদ্দেশ্য পুস্তক থেকে উদ্ধৃত)

যুগ ইমামের বাণী

বর্তমান যুগে দ্বীনের খেদমত এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণীকে সমুন্নত করার উদ্দেশ্যে আধুনিক জ্ঞান অর্জন এবং যারপরনায় সাধনার প্রয়োজন। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে রসুল করীম (সা.) এর শিক্ষা এবং তাঁর পবিত্র আদর্শ

বিচার ব্যবস্থার স্থাপনা

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সব থেকে গুরুত্ব হল বিচার বিভাগ যার প্রবর্তন হয়েছিল স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সা.)এর পবিত্র হাত ধরে। এটি এমন এক অতুলনীয় নীতিমালার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং যা প্রয়োগের মাধ্যমে অত্যাচারীরা নির্মূল হবে এবং অত্যাচারিতরা নিজেদের অধিকার লাভ করবে। কুরআন করীম এবং হাদীসে এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর রসুল করীম (সা.) নিজের আদর্শ দ্বারা দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মুসলমানদেরকে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা উচিত। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, মামলা মোকদ্দমায় বাদি পক্ষ এবং তাদের সাক্ষী নিজেদের দাবি প্রমাণ করার চেষ্টা করে আর বিচারক এটা দেখে যে, তাদের দাবি কতটা সত্য প্রমাণিত হয়। যদি বিচারকের দৃষ্টিতে সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান থাকে তবে বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং বাদি পক্ষকে তাদের অধিকার পাইয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাদি পক্ষ এবং সাক্ষী উভয়ে কাজ হল নিজেদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করা এবং বিচারকের কর্তব্য হল ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লায় তাদের দাবি যাচাই করা এবং যেটি ন্যায়সাপেক্ষ সেটিকে বাস্তবায়িত করা। তাই যেহেতু বাদি, সাক্ষী ও বিচারক প্রত্যেকেই নিজের নিজের কর্তব্য পালন করে।এই কারণে ইসলাম নীতিগতভাবে বাদি ও সাক্ষী-উভয়কে সততা অবলম্বনের নির্দেশ দান করে এবং বিচারককে ন্যায়পরায়ণতা ও পক্ষপাতশূন্যভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারকদের জন্য নির্দেশ

যেমন কুরআন করীম বিচারকদেরকে নির্দেশ দান করে-

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

অতঃপর রসুল করীম (সা.) কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَاِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○ ﴿المائدة: ۴۳﴾

অর্থ: এবং তুমি ফয়সালা কর তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে ন্যায়-পরায়ণতার সহিত ফয়সাল করিবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায় বিচারকগণকে ভালবাসেন।

(আল মায়েদা, আয়াত: ৪৩)

অপর এক স্থানে বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۫ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

অর্থ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসেবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।

(আল মায়েদা: ২য় রুকু)

বিচারকদের বিষয়ে ইসলামের নীতিগত নির্দেশ- اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিচারক অবশ্যই যোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ আরও কিছু শর্ত বর্ণনা করেছেন। যেমন, বিচারক এমন কোন ব্যক্তির হওয়া উচিত যার সততা, বিবেক-বুদ্ধি, কুরআনের বোধগম্যতা এবং হাদীসের জ্ঞানের প্রতি মানুষের আস্থা থাকা উচিত আর বিচারক যেন শরিয়তের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত থাকে।

সাক্ষী কেমন হওয়া বাঞ্ছনীয়

অপরদিকে সাক্ষীদেরকে ইসলাম সততার সাথে সাক্ষ্যদানের নির্দেশ প্রদান করেছে এবং বিশ্বস্ত মানুষদের সাক্ষ্য গ্রহণকে আবশ্যক করেছে । যেমন-কুরআন করীমে এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ কর। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, যাদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও সততার গুণ নেই তাদের সাক্ষ্য প্রদানের অধিকার নেই। কুরআন করীমের অপর এক আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয় যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'যারা কোন প্রকার মুসলমানের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ দেওয়ার পর অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে না, তাদের সাক্ষ্য কোন মোকদ্দমায় গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। যেমন তিনি বলেন, لا تقبلوا لهم شهادةً ابدًا তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করো না।

রসুল করীম (সা.) ও বলেছেন لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية খেয়ানতকারী (বিশ্বাসভঙ্গকারী) পুরুষ ও খেয়ানতকারী নারী, ব্যাভিচারী পুরুষ ও ব্যাভিচারীনি নারীর সাক্ষ্য বৈধ নয়। অনুরূপভাবে তিনি বলেন, সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য বৈধ নয় যে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। এছাড়া তিনি ভৃত্যের সাক্ষ্য সেই পরিবারের পক্ষে স্বীকার করেন নি যার সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখে। তবে কোন ভৃত্যের সাক্ষ্য অন্য কোন পরিবারের পক্ষে বৈধ হিসেবে গণ্য করেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন المسلمون عدولٌ بعضهم على بعض الا محدودًا فى القذف অর্থাৎ সকল মুসলমান সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সমান, কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যাকে অপবাদ আরোপ করার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আর এই কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেন, বিচারকের উচিত কেবল সাক্ষীর বাহ্যিক বিশ্বস্তাকেই যথেষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা, তাদের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে বিশেষ অনুসন্ধান না করা। কিন্তু সাহাবাদের যুগের যখন ইসলামে সব ধরণের মানুষ প্রবেশ করল, তখন ইসলামের বিচারবিভাগ সাক্ষীদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কেও অনুসন্ধান করত, যা তাদের সতর্কতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ।

সাক্ষ্যদানের কতিপয় নিয়ম

ইসলাম সাক্ষ্যদানের যে সাধারণ নিয়ম ধার্য করেছে তা এই যে, সাক্ষী বিবেকবান, সাবালক, সৎ মুসলমান, ভাল স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন এবং এমন ব্যক্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় যে কারো উপর কোন মিথ্যা অপবাদ দেয় নি। সাক্ষী এবং প্রমাণ বাদি পক্ষের কাছ থেকে চাওয়া উচিত। অন্যথায় বিবাদী পক্ষের কসম বা শপথ নেওয়া উচিত। শিশু ও কাফেরদের সাক্ষ্য দান সম্পর্কে মতানৈক্য আছে। অধিকাংশের মতে, শিশুদের সাক্ষ্য স্বীকার করা যেতে পারে তবে শর্ত হল তাদের মধ্যে যেন ঘটনা বোঝার ক্ষমতা থাকে, তাদের সংখ্যা দুই বা ততধিক হতে হবে এবং তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে যেন মিল থাকে। অনুরূপভাবে ফিকাহবিদগণ আরও কিছু শর্ত জরুরী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কাফেরদের সাক্ষ্য কোন কোন সময় সঠিক হিসেবে মনে করা হয়েছে। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি কোন মুসলমান থাকা অবস্থায় সফরে থাকে এবং প্রবাসে থাকাকালীন তার মৃত্যু হয় আর সেখানে কোন মুসলমান না থাকে তবে নিজের ওসীয়্যতের বিষয়ে অমুসলিমদের সাক্ষী করতে পারে। যেমনটি বলা হয়েছে-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ

অর্থাৎ যখন কোন মুসলমান মৃত্যুর মুখোমুখি সময় ওসীয়ত করতে মনস্থির করে, তবে সাধারণ নিয়ম এটাই যে, সেই সময় দু'জন বিশ্বস্ত সাক্ষী থাকা উচিত। কিন্তু যদি তোমরা সফরে থাক আর সেখানে কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে অমুসলিমকেও সাক্ষী করতে পার।

'কিয়াফা সানাশ' (যে বিদ্যার সাহায্যে মানুষের বাহ্যিক পরিপাটি দেখে চরিত্র বলে দেওয়া যায়) এর সাক্ষ্য

ইসলামে 'কিয়াফা সানাশ' এর সাক্ষ্যও স্বীকৃত, স্বয়ং রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর মান্যতা দিয়েছেন। যেমন হযরত উসামা (রা.)-এর পিতা যায়েদ ফর্সা ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কালো ছিলেন। এই কারণে মানুষের মনে তাঁর বংশপরিচয় নিয়ে সংশয় ছিল। একদিন তারা উভয়ে চাদর মুড়ে ঘুমিয়ে ছিলেন আর তাদের পা দুটি অনাবৃত ছিল। এমতাবস্থায় একজন 'কিয়াফা সানাশ' দু'জনের পা দেখে বললেন, এই পা দুটি একে অপরের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেহেতু তার এই মন্তব্যে সাধারণ মানুষের সংশয় দূরীভূত হচ্ছিল, এই কারণে রসুল করীম (সা.) তার এই সাক্ষ্যদানে ভীষণ আনন্দিত হন।

যেমনটি وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتٰنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে যদি সাধারণত কোন বিষয়ে অন্ততপক্ষে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী থাকে তবে সাক্ষ্য পূর্ণ হয়। যদিও রসুল করীম (সা.) অনেক সময় বাদি পক্ষের কাছ থেকে হলফ নিয়ে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতেও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু কতিপয় ক্ষেত্রে এমন অবস্থাও দেখা দিয়েছে যেখানে সাক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন ব্যাভিচার প্রমাণের জন্য শরিয়ত চারজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী নির্ধারণ করেছে। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি ধনবান হওয়ার পর দেওলিয়া হওয়ার দাবি করে, যেমনটি মুসলিমের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, তবে সেটা

প্রমাণের জন্য অন্ততপক্ষে তিন জন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে।

সাক্ষ্য গোপন করা নিষেধ

لَا يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوْا ইসলাম সাক্ষীদেরকে এটাও নির্দেশ দেয়। যখন তাদেরকে সাক্ষ্যদানের জন্য ডাকা হয়, তবে তারা যেন আদালতে উপস্থিত হতে যেন অস্বীকার না করে। অনুরূপভাবে বলা হয়েছে–

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۚ

তোমরা সত্য সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি সত্য সাক্ষ্য গোপন করে তার অন্তর মলিন হয়ে যায়। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন–

الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَإِنَّهٗۤ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا

অর্থাৎ সর্বোত্তম সাক্ষী সেই ব্যক্তি যে সাক্ষ্য না চাওয়ার পূর্বেই প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিচারককে অবগত করে।

জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকার

ইসলাম বিচারককে জিজ্ঞাসাবাদ করার অধিকারও প্রদান করেছে। বস্তুত জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার মাঝে খুব দ্রুত পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তির টাকা ভর্তি থলে হারিয়ে যায় যেটা অন্য কোন ব্যক্তি কুড়িয়ে পায়। এখন ইসলামের শিক্ষা হল, সেই থলে তার প্রকৃত মালিককে হস্তান্তর করতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেটা কাকে দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সেই থলেটির বিষয়ে সঠিক সঠিক বর্ণনা দিতে পারবে, তারই হাতে সেটি তুলে দেওয়া হবে। এটা একটি নীতি যা রসুলুল্লাহ (সা.) বর্ণনা করে দিয়েছেন, যার আলোকে বিচারক একাধিক ধরণের প্রশ্ন করতে পারতে। যেমন- কি রঙের থলে ছিল? থলেটি কাপড়ের ছিল না কি চামড়ার? থলেতে কত টাকা ছিল? যাইহোক, জিজ্ঞাসাবাদ করার ফলে যেহেতু সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্য করা যায়, এই কারণে ইসলাম এটিকেও আবশ্যক আখ্যায়িত করেছে।

সুনিশ্চিত অনুমান ভিত্তিক সাক্ষ্য

অনেক সময় সুনিশ্চিত অনুমানের মাধ্যমে সত্য সম্পর্কে জানা যায়। যেমন হযরত ইউসুফ (আ.) যখন জুলেখা প্ররোচিত করতে চাইল এবং তাঁর কামিস ছিঁড়ে গেল, তখন জুলেখার পরিবারেরই এক সদস্য বলল, যদি ইউসুফের কুর্তা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তবে জুলেখা সত্য বলছে। আর যদি কুর্তা পিছনের দিকে ছেঁড়া থাকে তবে জুলেখা মিথ্যাবাদী আর ইউসুফ সত্যবাদী। আর অবশেষে এই অনুমানের ভিত্তিতেই হযরত ইউসুফ (আ.) কে নিরপরাধ মনে করা হল।

রসুল করীম (সা.)ও মোকাদ্দমাকে স্পষ্ট করতে অনুমানের উপর ভরসা করেছেন। একবার খায়বারে চুক্তির শর্ত অনুসারে ইহুদীদের একটা বিরাট ধন-সম্পদ মুসলমানদের করায়ত্তে এল। কিন্তু একজন ইহুদীর কাছে যখন সম্পদ চাওয়া হল, তখন সে তা দিতে অস্বীকার করে বলল, সেই সম্পদ যুদ্ধের কাজে খরচ হয়ে গেছে। রসুল করীম (সা.) এর তার কথায় ভরসা হল না, কেননা সম্পদের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল আর খরচ করার সময় অনেক কম ছিল। অবশেষে লোকেরা সাক্ষ্য দিল যে, তাকে একটি ভাঙা বাড়িতে ঘুরতে দেখা গেছে। অনুসন্ধান করা হলে সমস্ত সম্পদ সেই ভাঙা বাড়িতেই পাওয়া গেল।

সাক্ষীদেরকে সত্য বলার নির্দেশ

একথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইসলাম সাক্ষীদেরকে সত্য বলার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى- অর্থাৎ হে লোক সকল! যখনই তোমরা কোন কথা বল পুরোপুরি সত্য বল। যদি বিরুদ্ধে তোমার কোন আত্মীয়ও থাকুক না কেন।

এরপর মোমেনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ- অর্থাৎ তারা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে না।

অনুরূপভাবে বলা হয়েছে.

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

অর্থাৎ প্রতিমার কলুষতা এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাক।

রসুল করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে নিজের কোন ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করে সে নিজের উপর দোজখ অনিবার্য করে নিয়েছে। কোন এক সাহাবা জানতে চাইলেন, হে রসুলুল্লাহ! যদি অল্প পরিমাণে কোন সম্পদ হয়? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, 'পিলু' বৃক্ষের একটি ছোট্ট শাখাই হোক না কেন। একবার রসুল করীম (সা.) সাহাবাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে 'কবীরা' পাপসমূহ সম্পর্কে অবগত করব না? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রসুল! অবশ্যই বলুন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পিতামাতার অবাধ্যতা করো না। সেই সময় তিনি ঠেস দিয়ে বসে ছিলেন আর তিনি এই বলে উঠে পড়লেন যে, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। আর এই শেষ শব্দদুটির তিনি অনেক বার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং বার সতর্ক করে বললেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অনেক বড় অপরাধ। বস্তুত, ইসলাম সত্য কথা বলার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় এবং সব সময় এটিকে দৃষ্টিপটে রাখাকে আবশ্যক আখ্যায়িত করে।

উৎকোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ

অতঃপর ইসলাম আরও এক পা এগিয়ে ন্যায় ও সুবিচারের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী সমস্ত বিষয়কে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন ন্যায়ের পথে সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হল উৎকোচ বা ঘুষ। ইসলাম সরাসরি এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوْۤا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَاۤ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার। (সূরা বাকারা: ১৮৯)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, উৎকোচ দাতা এবং উৎকোচ গ্রহীতা-উভয়ের প্রতি আঁ হযরত (সা.) অভিসম্পাত করেছেন। ফিকাহবিদগণ বিচারকদের উপর আরও অনেক ধরণের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। যেমন, তাদের মতে বিচারক কোন পক্ষের বাড়িতে বিশেষ আমন্ত্রণে যেতে পারে না। অনুরূপভাবে কেউ যদি তাকে কোন উপহার পাঠায় তবে তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। যদিও নিজের নিকট আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে দেওয়া উপহার সে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার কাছে যখন কোন মামলা-মোকদ্দমা থাকে, তখন তাদের উপহারও গ্রহণ করা উচিত নয়।

ক্রোধান্বিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়

উৎকোচ ছাড়াও অনেকে আবেগের বশবর্তীও হয়ে পড়ে আর এভাবে তারা বিচার করার সময় সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি তিনি বলেছেন لَا يَحْكُمْ اَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ অর্থাৎ বিচারক ক্রোধের মাথায় যেন সিদ্ধান্ত না লেখে। কেননা, এমতাবস্থায় তার দৃষ্টি ন্যায় পর্যন্ত না পোঁছনোর সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

অনুরূপভাবে কোন পক্ষের কান্নাকাটি দ্বারাও বিচারক যেন প্রভাবিত না হয়। এর প্রমাণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে,যেমনটি কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, হযরত ইউসুফ (আ.)এর ভাইয়েরা রাতের বেলা পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল। অথচ তারা অপরাধী ছিল।

বিচারক পদের দায়িত্ব

বস্তুত বিচারক হওয়া কোন সহজ কাজ নয়, এটা অনেক বড় দায়িত্বের কাজ আর বাদি ও বিবাদী উভয়পক্ষের সঙ্গে সমান আচরণ করা এবং কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির দাপটে মোকদ্দমার সময় তার প্রতি তারতম্যপূর্ণ আচরণ না করা বিচারকের কর্তব্য। এই কারণেই রসুল করীম (সা.) বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের। দুই প্রকারের বিচারক জাহান্নামে যাবে আর এক প্রকার জান্নাতে যাবে। জান্নাতে গমনকারী বিচারক সেই ব্যক্তি যে সত্য অনুধাবন করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু যে বিচারক অন্যায়পূর্ণ সিদ্ধান্ত করেছে কিম্বা কোন তদন্ত না করেই সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছে তারা শাস্তি পাবে।

খুশি মনে বিচার মেনে নেওয়া উচিত।

ইসলাম বিচার বিভাগের বিষয়ে আরও একটি নির্দেশ দিয়েছে। যখন কোন বিচারক সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে,তখন যদিও সে নিজের সিদ্ধান্তে ভুলও করতে পারে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া মানুষের কর্তব্য। যদি আবেদনের সুযোগ থাকে তবে উর্ধ্বতন বিচারকের কাছে আবেদন করা যেতে পারে আর উচ্চ আদালত নিম্ন আদালতের রায়কে বাতিল করতে পারে। যেমন সুনান নিসাঈ কিতাব আদাবুল কাজা

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ ইমামের বাণী

যাঁর আশিস ও কল্যাণের ধারা সদা প্রবাহমান, তিনিই হলেন জীবিত নবী। (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rashid, Basantapur, 24 PGS (S)

থেকে প্রকাশ পায়। কিন্তু বিচারকের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে অস্বীকার করা এবং এর দ্বারা সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অর্থাৎ কিন্তু না, তোমার প্রভুর কসম, তাহারা মো'মেন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সেই সকল বিষয়ে তোমাকে বিচারক রূপে মান্য করিবে যে সকল বিষয়ে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় এবং যে সকল বিষয়ে তুমি ফয়সালা কর উহাতে তাহারা নিজেদের অন্তরে সংকোচ বোধ না করিবে এবং পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিবে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ৬৬)

যদিও এই আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু এমন কিন্তু এমন আদেশসমূহ যেগুলি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে সেগুলি রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর সত্তার জন্য নির্দিষ্ট নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য বাস্তবায়ন যোগ্য। অতএব, ইসলামের নির্দেশ এই যে, বিচারকের সিদ্ধান্তকে মানুষের উদার মনে গ্রহণ করা এবং ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধা রাখা উচিত।

রসুল করীম (সা.)-এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত

এটি ইসলামের সেই শিক্ষার এক অতি সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ চিত্র যা বিচারকদের সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখন এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হচ্ছে।

রসুল করীম (সা.) যখন হিজরত করে মদিনা এলেন, তখন যেহেতু মুসলমানরা ছাড়া সেখানে পৌত্তলিক ও ইহুদীরাও বসবাস করত, এছাড়াও মুনাফেকদেরও কিছুটা অস্তিত্ব ছিল, এই কারণে রসুলুল্লাহ (সা.) পরস্পরের সঙ্গে মিলে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা যথোপযুক্ত মনে করলেন। মুনাফিকরা যেহেতু নিজেদেরকে ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে দাবি করত, যদিও অভ্যন্তরীণভাবে তারা ইসলামের বিরোধী ছিল, এই কারণে তারা বাহ্যিকভাবে আঁ হযরত (সা.) এর শাসন মেনে নিতে বাধ্য ছিল। পৌত্তলিকরা যেহেতু সংখ্যায় অনেক কম ছিল, এই কারণে রাজনীনৈতিকভাবেও তারা মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। কেবল ইহুদীরাই স্বাধীন ও স্বানির্ভর ছিল, যাদের পক্ষ থেকে শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) শহরের শান্তি ও বিভিন্ন জাতির নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সমীচীন মনে করলেন। সুতরাং এই চুক্তি নির্ধারিত হয়। এর কিছু শর্তাবলী ছিল যার মধ্যে একটি শর্ত ছিল, প্রত্যেক প্রকরের বিবাদ ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য আঁ হযরত (সা.)–এর সামনে উপস্থাপিত হবে আর প্রতিটি সিদ্ধান্ত ঐশী আদেশ অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির নিজের শরিয়ত বিধান অনুসারে গৃহীত হবে। এই চুক্তির সুবাদে আঁ হযরত (সা.) মদিনার প্রশাসক বা আন্তর্জাতিক বিচারকের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন আর প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ মোকাদ্দমা আঁ হযরত (সা.)–এর সমীপে উপস্থাপিত হতে শুরু করল। আর তিনি (সা.) প্রত্যেখ জাতির বিধান ও নিয়ম অনুসারে সিদ্ধান্ত প্রদান করতেন। যেমনটি বর্ণিত হয়েছে যে, ৪র্থ হিজরীর শেষের দিকে আঁ হযরত (সা.)–এর সমীপে একজন ইহুদী পুরুষ ও মহিলার মোকদ্দমা উপস্থাপিত হয়। তাদের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) ইহুদী উলেমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমাদের শরিয়তে এর নিদান কি? তারা মিথ্যা বলল এবং জানাল যে, তাদের ধর্মে এর শাস্তি হল ব্যাভিচারীর মুখে কালি মাখিয়ে বাহনের উপর বসিয়ে শহর ঘোরানো। সেই সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালামও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রসুল! এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে। তওরাতে এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে লেখা আছে–পাথর মেরে হত্যা করা। তাই তওরাত চেয়ে পাঠানো হয়। ইহুদীরা পাথর মেরে হত্যার আয়াতটির উপর হাত রেখে সেটিকে লুকোতে চাইল, কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন সালাম দেখিয়ে দেন যে, তওরাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই অপরাধের শাস্তি হল পাথর মেরে হত্যা করা। আর যেহেতু চুক্তিতে এটাই লেখা ছিল যে, প্রত্যেক জাতির মামলা মুকদ্দমার সিদ্ধান্ত তাদের নিজস্ব ধর্মীয় বিধান মেনে হবে। তাই আঁ হযরত (সা.) সিদ্ধান্ত শোনালেন যে, ইহুদী শরিয়ত অনুসারে এদের দুজনকে পাথর মেরে হত্যা করা হোক। এইরূপে তাদের দুজনকে পাথর মেরে হত্যা করা হয়।

বনু নাযির সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

রসুল করীম (সা.) এর পবিত্র জীবনীর আরও একটি অত্যুজ্জ্বল দিক হল তিনি (সা.) বিচার ব্যবস্থায় মুসলিম ও অমুসলিমদের অধিকার সমান মনে করতেন আর যদি কোন মুকদ্দমায় মুসলমান দোষী হত তবে তার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতেন। যেমন বনু নাযির গোত্র যখন মদিনা থেকে বিতাড়িত হল, তখন কিছু আনসার সেই সব লোককে সঙ্গে যেতে বাধা দিতে চাইলেন, যারা আনসারদের সন্তান হলেও ইহুদীদের রীতি মেনে চলার কারণে ইহুদী হয়ে গিয়েছিল আর বানু নাজির তাদেরকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইত। যেহেতু আনসারদের এই দাবি কুরআন করীমের আদেশ لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ এর পরিপন্থী ছিল, সেই কারণে রসুল করীম (সা.) এর সামনে যখন এই বিষয়টি উপস্থাপিত হল,তখন তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং ইহুদীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।। আর বললেন, যে ব্যক্তি ইহুদী এবং যেতে চায়, মুসলমান তাকে বাধা দিতে পারবে না।

চুরির ঘটনা

একবার বনু মখযুম গোত্রের ফাতিমা বিনতে আসাদ নামে এক মহিলা চুরি করে আর রসুল করীম (সা.) এর সামনে তাকে উপস্থিত করা হয়। কুরায়েশদের মনে এই ভীতি তৈরী হল যে, তিনি সাধারণ মানুষের মত তার হাত কর্তন করার নির্দেশ না দেন। কিন্তু এ বিষয়ে রসুল করীম (সা.) কে কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস তাদের ছিল না। অবশেষে তারা এই উদ্দেশ্যে উসামা বিন যায়েদকে নিযুক্ত করে। কেননা রসুল তাকে অনেক ভালবাসতেন আর তারা মনে করেছিল, উসামা সুপারিশ করলে রসুল করীম (সা.) তার কথা মেনে নিবেন। কিন্তু উসামা যখন রসুল করীম (সা.) এর সামনে এ বিষয়ের উল্লেখ করেন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তার সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, বনী ইসরাঈল জাতির অভ্যাস ছিল, যখন তাদের মধ্যে কোন সম্মানীয় ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত আর কোন দরিদ্র ব্যক্তি চুরি করলে তার হাত কেটে ফেলত। এই কারণেই তারা ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু আমি বিচারের বিষয়ে কাউকে কোন খাতির করব না। খোদার কসম! আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি করে তবে আমি তার হাত কেটে ফেলব। এর থেকে জানা যায় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বিচারের ক্ষেত্রে ধনী গরীব সকলের মাঝে কোন ভেদাভেদ করতেন। এই হাদীস থেকে এই বিষয়টিও প্রমাণিত হয় যে, বিচারকের কাছে এমন বিষয়ে কাউকে কোন সুপারিশ করা উচিত নয়। আর যদি কোন ব্যক্তি ভুল করে সুপারিশ করে দেয় তবে বিচারকের কর্তব্য হল সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করা এবং তার উচিত কেবল সেই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যা তার নিজের মতে সঠিক।

আবুল আস এর গ্রেপ্তারি

বদরের যুদ্ধে যেখানে কুরায়েশ এবং তাদের সর্দাররা গ্রেপ্তার হয়, সেখানে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর জামাত আবুল আসও গ্রেপ্তার হয়ে আসেন এবং সমস্ত কয়েদীদের সঙ্গে তাকেও রাখা হয়। তাঁর কাছে ফিদিয়া দানের জন্য কোন সম্পদ ছিল না। তাই তাকে বাড়ি থেকে চেয়ে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হল। তিনি নিজ স্ত্রী তথা রসুল তনয়া হযরত জয়নবকে বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি ফিদিয়া হিসেবে একটি মালা প্রেরণ করেন যেটি হযরত খাদিজার ছিল আর তিনি বিবাহের দান হিসেবে হযরত জয়নবকে দিয়েছিলেন। সেই মালাটি যখন রসুল করীম (সা.) এর সামনে উপস্থাপিত হর,তখন তাঁর হযরত খাদিজার কথা মনে পড়ে যায় আর আবেগ তাড়িত হয়ে তাঁর চোখ দুটি অশ্রসজল হয়ে পড়ে। তিনি মুক্তিপণ ছাড়াই আবুল আসকে মুক্তি দিতে পারতেন, কিন্তু এই বিষয়টি মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করে বলেন, যদি তোমরা পছন্দ কর তবে জয়নবকে তার মায়ের এই স্মৃতিটুকু ফিরিয়ে দেওয়া হোক। সকলে আনন্দ সহকারে এই প্রস্তাব পছন্দ করল এবং এরপর আবুল আসকে মুক্তি দেওয়া হল।

আবু জিন্দলকে সমর্থন করতে রসুল করীম (সা.) এর অসম্মতি

হুদায়বিয়া নামক স্থানে মুসলমন ও কাফেরদের মাঝে সম্পাদিত চুক্তির একটি শর্ত ছিল, যদি কোন ব্যক্তি মক্কা থেকে পালিয়ে মুসলমান হয়ে মুসলমানদের কাছে পালিয়ে আসে তবে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু যদি মুসলমানদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি ধর্মচ্যুত হয়ে মক্কায় চলে আসে তবে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। এই চুক্তি তখনও সম্পাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল, ঠিক এমন সময় আবু জিন্দল নামী এক মুসলমান যাকে মক্কার কাফেররা বন্দী করে রেখেছিল, সে তাদের হাত থেকে পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়। সেই সময় তার পায়ে বেড়ি পরানো ছিল আর শরীর ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় ছিল। সে মুসলমানদেরকে এসে বলল, খোদার দোহাই, আমাকে কাফেরদের কয়েদ থেকে বের করে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে চল। সেই সময় রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সঙ্গে চৌদ্দশ সশস্ত্র সেনা ছিল আর তাঁর ইঙ্গিত মাত্রই আবু জিন্দল এর মুক্তি সম্ভব ছিল। মুসলমানেরা নিজেরাও নিজেদের ভাইয়ের এমন দয়নীয় দশা দেখে আকুল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) আবু জিন্দল এর সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, কাফেরদের সঙ্গে এই শর্তে

এরপর ২৩ পাতায়

মহানবী (সা.)-এর মহিলা সাহাবীয়াগণের অবিস্মরণীয় কুরবানী

অনুবাদ: রফিকুল ইসলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা, বাংলা ডেস্ক, কাদিয়ান *[মূল- আমাতুল ওয়াসে শুমাইলা, নায়েব সদর লাজনা ভারত]*

শ্রদ্ধেয়া সভাপতি মহাশয়া ও সুধী শ্রোতামণ্ডলী!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আজ এক কল্যাণময় সভাবে আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল, 'মহানবী (সা.)-এর মহিলা সাহাবীয়াগণের অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তমূলক কুরবানী।' আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ۝

অর্থাৎ যে কেউ মোমেন থাক অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে নর হোক বা নারী, আমরা নিশ্চয় তাকে এক পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই আমরা তাদের সর্বোত্তম কৃত-কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করব।

এমনই এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছি মহানবী (সা.) বলেন, সাহাবাদের মতানৈক্য সম্পর্কে আমি আল্লাহ্ তা'লার নিকট জানতে চাইলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ওহীর মাধ্যমে বলেন, হে মুহাম্মদ! আমার নিকট তোমার সাহাবাদের পদমর্যাদা হল, আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। অতএব যে কেউ তোমার কোন সাহাবীর অনুসরণ করবে আমার নিকট সে হেদায়াত প্রাপ্ত বলে পরিগণিত হবে। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন,হুযুর (সা.) বলেন, আমার সাহাবারা নক্ষত্রের ন্যায়। তাদের মধ্য হইতে যাকেই তোমরা অনুসরণ করবে হেদায়াত প্রাপ্ত হবে।

(মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, মানাকিবুস সাহাবা, পৃ: ৫৫৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন-

''পবিত্র কুরআন হতে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মের ইতিহাসে মহিলাদের গুরুত্ব অপরিসীম। মহিলাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উক্ত প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য নারীদের সেই পুরস্কারের অংশীদার করেছেন যে কাজের জন্য পুরুষদের প্রতিদানযোগ্য বিবেচিত করা হয়েছে বা প্রতিদান দেওয়া হয়েছে।

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, জলসা সালানা জার্মানী, ২০১৮)

সুধী শ্রোতামণ্ডলী! এই দিকনির্দেশনা পালনের নিমিত্তে নারীদের জন্য আবশ্যক হল, মহিলা সাহাবীয়াগণের জীবনি এবং তাদের পবিত্র জীবনের মহান ত্যাগের ঘটনাবলী পুনরাবৃত্তি করা যাতে আমরা সর্বদা তাদের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তকে স্মরণ করতে পারি, আমাদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সেই আবেগ, উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভালবাসা সৃষ্টি হয় যে, আমরা ইসলামের জন্য স্বীয় প্রাণ,সম্পদ, সময় ও সন্তান-সন্ততিকে উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকতে পারি।

মহানবী (সা.)-এর সাহাবীয়াদের জীবন অধ্যায়ন করলে ইসলামের জন্য তাঁদেরএমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়,যার দৃষ্টান্ত অপর কোন ধর্মেই নেই। কখনো আথির্ক ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, কখনো তা আবেগের বলিদান, আবার কখনো বা কুরবানীস্বরূপ প্রাণকে উপস্থাপন করা হচ্ছে, আবার কোথাও সন্তানদের উপদেশ দিতে দেখা গিয়েছে যে, যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর তাহলে কিয়ামতের দিন দুধের ঋণ ক্ষমা করব না।

এই ধরণের অগণিত ঈমান উদ্দীপক দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইসলামের আকাশে এই সাহাবীয়াদেরকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সমুজ্জ্বল হতে দেখা যায়। মহানবী (সা.) এর সাহাবীয়াগণের অগণিত অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্তমূলক কুরবানী রয়েছে। এই কয়েক মিনিটের বক্তৃতায় তাদের সব উল্লেখ করা দুরূহ বিষয়। আজ আমি কয়েকজন সাহাবীয়ার ত্যাগের কথা উল্লেখ করব যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.)এর প্রতি আনুগত্য, নিষ্ঠা ও ভালবাসার চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, ধর্মের জন আত্মত্যাগ করেছেন, কষ্ট সহ্য করেছেন এবং যুদ্ধের ময়দানে বিভিন্ন সেবা প্রদান করেছেন।

শ্রোতামণ্ডলী! আমি সর্বাগ্রে উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.)-এর কথা উল্লেখ করব, যিনি সকল প্রকার কুরবানীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন।

চল্লিশ বছর বয়সে তিনি আঁ হযরত (সা.) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাপ-দাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদ, স্বীয় পরিশ্রমে যাকে বৃদ্ধি করেছিলেন তার সবটাই নবী করীম (সা.)-এর সমীপে উপস্থাপন করেছিলেন। কেননা, তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল হতে হাক্কুল একীন বা অভিজ্ঞতা লব্ধ নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, আমার সঙ্গী অতীব বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান। এটি একটি মহান আত্মত্যাগ। এ পুঁজি ইসলামকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আঁ হযরত (সা.) এর উত্তম চরিত্রে এই দিকটি বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে,সম্পদের প্রতি তাঁর কোন লালসা নেই এবং তিনি গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। ক্রীতদাসদের মুক্ত করার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবতার মহান দিকটি উন্মোচিত হয়। একজন নারীর কুরবানী প্রভূত উপকার সাধন করেছিল আর এর সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ্র রসূল (সা.)। তিনি বলেন,

খাদিজা (রা.) সেই সময় তাঁর সম্পদ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন যখন অন্যরা সেই সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে নি।

(মুসনাদে আহমদ, খণ্ড-৬,পৃ: ১১৮)

ইবাদতের প্রতি স্বামীর অনুরাগ দেখে তিনি বিরক্ত হন নি বরং সমর্থন করে মনে প্রাণে তাঁর সেবায় নিয়োজিত হয়েছিলেন। হেরা পর্বতের গুহায় একাকী ইবাদতের সময় তাঁর (রা.) বয়স ছিল প্রায় পঞ্চান্ন বছর। তখন তিনি (রা.) রসুলুল্লাহ (সা.) এর জন্য খাবার তৈরী করে দিতেন আবার কখনও বেশি দিন হয়ে গেলে তিনি নিজেই খাবার নিয়ে হেরা গুহায় যেতেন। হেরা গুহার সংকীর্ণ রাস্তা এবং পবিত্রতার কথা মাথায় রেখে এই মহান নারীর আত্মত্যাগের অনুমান করুন। এটি এমন একটি মহান কাজ ছিল যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ কাছ থেকে প্রশংসার বার্তা এসেছিল। হযরত জিব্রাইল (আ.) এসে বলেন-

"হে আল্লাহ্র রসুল! হযরত খাদিজা (রা.) একটি পাত্র নিয়ে আসছেন যাতে কিছু তরকারি, খাবার বা পানীয় বস্তু আছে। তিনি যখন আপনার কাছে উপস্থিত হবেন, তখন মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতের মুক্তার প্রসাদের সুসংবাদ প্রদান করবেন যার মধ্যে কোন গোলযোগ বা ক্লান্তি থাকবে না। "

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েলুস সাহাব,বাব ফযলু খাদিজা)

মহানবী (সা.) যখন নবুয্যত প্রাপ্ত হন, তখন তাঁদের বৈবাহিক বন্ধনের বয়স ছিল পনেরো বছর। এই মহান মহিলা তাঁর (সা.) সমর্থনে এমন একটি বাক্য বলেছিলেন যা মহানবী (সা.) এর উত্তম আদর্শকে প্রতিবিম্বিত করে। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ আপনাকে কখনই অপদস্ত করবেন না কারণ আপনি আপনার আত্মীয়দের প্রতি সদয় আচরণ করেন এবং সদা সত্য কথা বলেন। আপনি মানুষের বোঝা বহন করেন এবং আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন এবং মানুষকে দুঃখ-কষ্টে সাহায্য করেন। এমন গুণী ব্যক্তির কি বিপদ হতে পারে?

(বুখারী, কিতাবু বাদাউল ওহী)

ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরোধিতার প্রতাপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ৭ম নববীতে কুরাইশরা ইসলামের ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যখন পরিকল্পনা করে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর পরিবারকে শি'বে আবি তালিব উপত্যকায় অবরোধ করেছিল। এই অবরোধে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সঙ্গে হযরত খাদিজাও ছিলেন। তিন বছরে এই সময়টা কেটেছে নিরন্তর ত্যাগে, খোলা আকাশের নীচে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, আবহাওয়ার প্রচণ্ডতা,প্রিয়জনের বিচ্ছেদ এবং আরও অনেক কিছু। কিন্তু তিনি (রা.) রসুলুল্লাহ্র সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। কিন্তু ক্ষুধা তার প্রভাব দেখিয়েছিল এবং এই দুর্বিষহ যুগে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর এই বিশ্বস্ত স্ত্রী মৃত্যু বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহিওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আঁ হযরত (সা.) উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.)-এর বিচ্ছেদ আজীবন ভুলতে পারেন নি। তিনি কতই না সৌভাগ্যবান নারী যাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছিলেন,

"খাদিজার চেয়ে ভালো কেউ হতে পারে না। তিনি আমার প্রতি তখন বিশ্বাস আনয়ন করেছিলেন যখন সমগ্র বিশ্ব আমাকে অস্বীকার করেছিল এবং তিনি তখন আমার সত্যায়ন করেছিলেন যখন সমস্ত বিশ্ব আমাকে মিথ্যা প্রতিপাদন করেছিল। তিনি তখন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রদান করে সহানুভূতি ও উপকার করেছিলেন যখন সমস্ত মানুষ আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। হে আয়েশা! আমি কি করব? খাদিজার ভালবাসা তো আমাকে পান করানো হয়েছে এবং আমার হৃদয়ে স্থাপন করা হয়েছে।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

শ্রদ্ধেয় মওলনা দোস্ত মহম্মদ শাহিদ সাহেবের কথায়, আমি তাঁর (রা.) প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তিনি বলেন,

উম্মুল মোমেনীন হযরত খাদিজা (রা.) আজ পৃথিবীতে নেই এবং তাঁর কবরের চিহ্নও মুছে গেছে। কিন্তু তাঁর কাজ ও তাঁর নাম উভয়ই চিরঞ্জীব। এভাবে মহানবী (সা.)-এর কল্যাণময় মুখনিঃসৃত প্রশংসাসূচক বাক্যবলীও ধরাভূমি থেকে মুছে যাবে না। তা অবশ্যই প্রত্যেক রসুল প্রেমিকের মন মস্তিষ্কে সুরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে। গৌরব ও পবিত্রতার শাশ্বত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হযরত খাদিজা, জীবিত রসুল ও নবীকূল সম্রাট মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রথম জীবন সঙ্গীনী হিসেবে অবশ্যই দু'জাহানের সাম্রাজ্ঞী।

মুহাম্মদ (সা.) এর খোদার কসম! বিশ্বের কোন পরাশক্তি তাঁর (রা.) কাছ থেকে এই আধ্যাত্মিক শিরোপা ছিনিয়ে নিতে পারবে না এবং কখনও তাঁর ঐশী সাম্রাজ্যের পতনও হবে না।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى أَزْوَاجِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-''

দ্বিতীয় বিবরণ হযরত আয়েশা (রা.) যিনি হযরত মহানবী (সা.) এর সব চেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। আয়েশা (রা.)এর ছবি আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.) কে রেশমি রুমালে মোড়া

অবস্থায় দেখিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর জীবনের কমবেশি মাত্র নয় বছর আঁ হযরত (সা.)এর সঙ্গে কাটিয়েছিলেন।। তিনি (রা.) এত বেশি ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করেছিলেন যে তিনি মুজতাহিদীন সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হন।

জামে তিরমিযিতে হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা এমন কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হইনি যা আমরা হযরত আয়েশা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করেছি এবং তিনি এ বিষয়ে কোন তথ্য প্রদান করেন নি। স্বল্প বয়স সত্ত্বে হযরত আয়েশা (রা.) এর বিবাহ আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে হয়েছিল। আঁ হযরত (সা.) কে তিনি পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। মহানবী (সা.) জগত বিমুখ জীবনযাপন করতেন। বহু দিন এমন অতিবাহিত হত যখন বাড়িতে চুলো জ্বলত না। মাটির বাড়ি ছিল। হযরত আয়েশা (রা.) ঘরের যাবতীয় কাজকর্ম করতেন। জাঁতা ঘোরাতেন, আটা মাখাতেন, রান্না করতেন। মহানবী (সা.) সর্বদা নিজের হাতে শয্যা প্রস্তুত করতেন, মাথার কাছে পানি ও মিসওয়াক রাখতেন। তিনি (রা.) বলেন,আমাদের মধ্যে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে এক জোড়া কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় ছিল না। তিনি মহানবী (সা.) এর সাথে যুদ্ধে অংশ নিতেন এবং আহতদের পানি পান করাতেন।

যখন বিজয়ের সময়কাল শুরু হয় এবং মালে গণীমত প্রচুর পরিমাণে আসতে শুরু করে, তখন স্ত্রীরাও ভরণপোষণ বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ইলার মেয়াদ শেষ হলে মহানবী (সা.)-এর সর্বপ্রথম হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসেন এবং সুরা আল আহযাবের ২৮-২৯ নং আয়াতে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পাঠ করেন, যার অনুবাদ হল,

হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, 'যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও এর শোভা-সৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এস, আমি তোমাদেরকে সুখ সম্ভোগের সামগ্রী দিব এবং তোমাদেরকে অতি সুন্দরভাবে বিদায় দিব। কিন্তু যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং পারলৌকিক গৃহ কামনা কর, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হতে সৎকর্মশীলগণের জন্য মহান পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।'

তিনি (সা.) বলেন, 'আমি এর উত্তর চাই।'

শ্রোতামণ্ডলী! নিঃসন্দেহে, সাময়িকভাবে মালে গণীমতের প্রাচুর্যতা লক্ষ্য করে স্ত্রীরাও ভরণপোষণ বাড়ানোর আবেদন করেছিলেন। কিন্তু রসুল (সা.)-এর অসন্তুষ্টিকে কে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারে? তৎক্ষণাৎ হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দেন, হে আমার প্রভু! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল এবং পারলৌকিক গৃহকে পছন্দ করি। বাকি স্ত্রীরাও একই জবাব দেন এবং বিশ্বের সকল মুসলমান নারীদের জন্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

আঁ হযরত (সা.)এর যখন মৃত্যু হয় তখন হযরত আয়েশা (রা.) বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য্য ও অবিচলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর (রা.) হুজরা মহানবী (সা.) এর অন্তিম বিশ্রামস্থলে পরিণত হয়। অতঃপর উক্ত হুজরাতে হযরত আবু বকর (রা.)-এর দাফনও হয়। হযরত আয়েশা (রা.) এর সত্তার সঙ্গে আবেগের এক মহান আত্মত্যাগ জড়িত আছে। হুজরার মধ্যে অবশিষ্ট জায়গা তিনি (রা.) নিজের জন্য রেখেছিলেন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তাঁর পুত্রকে হযরত আয়েশা (রা.) এর কাছে প্রেরণ করেন এবং উক্ত হুজরাতে দাফন হওয়ার অনুমতি চান,তখন হযরত হযরত আয়েশা (রা.) বলেছিলেন, এই জায়গা আমি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম। কিন্তু আজ আমি আমার সত্তার উপর হযরত উমর (রা.) কে প্রাধান্য দান করছি। হযরত আয়েশা (রা.) এর এই মহান আত্মত্যাগ যে, খলীফার অভিপ্রায় পুরণের জন্য প্রাণ প্রিয় স্বামী ও মহান পিতার সাথে কবরস্থ হওয়ার বাসনাকে তিনি বলিদান দিয়েছিলেন।

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত উম্মে সালমা (রা.)এর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করুন। তিনি খুবই যত্নের সাথে লালিত পালিত হয়েছিলেন। মুসলমান হওয়ার পর তিনি স্বামীর সাথে আবি সিনিয়ায়ায় চলে যান। তাঁর স্বামী আবু সালমা (রা.) ছিলেন মহানবী (সা.)–এর দুধ ভাই। তিনিই হিজরতকারী প্রথম মহিলা ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া থেকে ফিরে মদিনায় হিজরত করতে চেয়েছিলেন। কারণ মক্কার ভূমি পূর্বের চেয়ে অধিক রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছিল। হিজরতের সময় তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে বাধা দিয়েছিল এবং তাঁকে যেতে দেয় নি। অবশেষে আবু সালামা (রা.) একাই মদিনায় চলে যান। তাঁর চলে যাওয়ার পর শ্বশুর বাড়ির লোকেরা এসে তাঁর নিষ্পাপ শিশু সালমাকে ছিনিয়ে চলে যায় এই বলে যে, এটি আমাদের সন্তান। উম্মে সালামা (লা.) খুব কষ্ট পান। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে প্রতিদিন তিনি মাঠে-ঘাটে বের হয়ে যেতেন। আর সারাদিন কেঁদে বেড়াতেন। একবছর ধরে এই অবস্থা বিরজমান ছিল। অবশেষে তাঁর চাচাতো ভাইয়ের দয়া হয়। সে বলে,' হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা এই অসহায় মহিলাকে কেন মুক্ত করছ না?' তখন তাদেরও একটু করুণা হয় এবং তাঁকে তাঁর স্বামীর কাছে যেতে দেয়। শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরাও একই কথা চিন্তা করে সন্তানটিকে তাঁর কাছে চলে যেতে দেয়। অতঃপর তিনি (রা.)মদিনায় পৌঁছন। তাঁর স্বামী আবু সালামা (রা.) ছিলেন একজন দক্ষ অশ্বারোহী।ওহদের যুদ্ধে তিনি এমন আঘাত পেয়েছিলেন যে আরোগ্য লাভ করতে পারেন নি। কিছু দিন পর তার ক্ষত ফেটে যায় এবং তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আঁ হযরত (সা.) তাঁর বাড়িতে আসেন। একটা উন্মাদনার পরিস্থিতি ছিল। উম্মে সালমা (রা.) বলেছিলেন, হায় এ কী করুণ মৃত্যু! আঁ হযরত (সা.) ধৈর্য্যের উপদেশ দিয়ে বলেন, দোয়া করুন যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে তার চেয়ে উত্তম সঙ্গী দান করুন। আঁ হযরত(সা.) আবু সালমার জানাযার নামাযে ৯বার তাকবীর পাঠ করেন এবং লোকেরা জিজ্ঞাসা করলে তিনি (সা.) বলেন, তিনি এক হাজার তাকবীরের যোগ্য ছিলেন। সেই সময় উম্মে সালমা গর্ভবতী ছিলেন। গর্ভাবস্থা শেষে ইদ্দত পালনের পর আঁ হযরত (সা.) বার্তা পাঠালেন। উম্মে সালমা আপত্তি উপস্থাপন করে বলেন, আমি অতীব লজ্জাশীল, আমার সন্তান আছে এবং আমার বয়সও হয়েছে। আঁ হযরত (সা.) তাঁর সকল আপত্তি খণ্ডন করেন, ফলে আঁ হযরত (সা.)এর সঙেগ তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রথম শহীদ মুসলিম নারী হযরত সুমাইয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে সপ্তম স্থানে ছিলেন। মুশরিকরা তাঁকে শিরক করানোর জন্য বলপূর্বক সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিল। মক্কার উত্তপ্ত বালির উপর লোহার বর্ম পরিয়ে সারাদিন তাঁকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় রোদে দাঁড় করিয়ে রাখত। কিন্তু তাঁর অবিচলতার সামনে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা যেত। এক রাতে আবু জেহেল তাকে গালি দিতে শুরু করে। অতঃপর তার ক্রোধ এতটাই তীব্র হয়ে ওঠে যে, সে উঠে এমন বর্শা নিক্ষেপ করে যে, হযরত সুমাইয়া (রা.) শহীদ হন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

বনু নাজ্জার গোত্রের সঙ্গে হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা.)-এর সম্পর্ক ছিল। তিনি মদিনায় জন্ম গ্রহণ করেন। হিজরীর তৃতীয় বর্ষে কাফেরদের লস্করের আগমণের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়, তখন হযরত উম্মে আম্মারাহ (রা.) যুদ্ধে আহতদের ব্যান্ডেজ ও পানি পান করানোর জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার অনুরোধ করেন, যা গৃহীত হয়। তিনি (রা.) তাঁর স্বামী ও দুই পুত্রের সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আহতদের পানি পান করানোর সময় তিনি আঁ হযরত (সা.)-কে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে পানির পাত্র ফেলে দিয়ে তরবারি ধারণ করে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে এসে শত্রুদের প্রতিরোধ শুরু করেন। কাফেররা তাঁকে ধ্বংস করার মানসে প্রচন্ড হিংস্রতার সাথে আক্রমণ করছিল। তাঁর আশপাশে খুব কম লোকই অবশিষ্ট ছিল যারা তাঁকে রক্ষা করতে তাদের জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করছিল। এমন জটিল এবং বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই বীরাঙ্গনা মহিলা মহানবী (সা.) এর বিপদকালে ইস্পাতের ন্যায় কাজ করেছিলেন। কাফেররা যখন মহানবী (সা.) কে আক্রমণ করত তখন তিনি (রা.) তীর ও তরবারি দিয়ে তাদের জবাব দিতেন। আঁ হযরত (সা.) নিজেই বলেছেন যে, ওহদের যুদ্ধে আমি উম্মে আম্মারাহকে ডানে-বামে সমানভাবে যুদ্ধ করতে দেখেছি। ইবনে কামিয়াহ যখন মহানবী (সা.) এর সন্নিকটে উপস্থিত হয় তখন এই সাহসী মহিলা (রা.) গতিরোধ করেন। উক্ত দুর্ভাগা লোকটি এমনভাবে তরবারি চালনা করে যে, সাহসী মহিলার কাঁধ ক্ষতবিক্ষত হয় এবং ক্ষত এতটাই জোরালো ছিল যে, তা গর্তে পরিণত হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি পিছপা হন নি, বরং এগিয়ে গিয়ে তরবারি দিয়ে তাকে আক্রমণ করেন এবং সেই আক্রমণ এতটাই জোরালো ছিল যে, উক্ত ব্যক্তি যদি দ্বি-স্তরীয় বর্ম না পরত তাহলে সে নিহত হত।

শ্রোতামন্ডলী! এখন আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) এর অবস্থা শুনুন। ঈমান আনয়নের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন ১৮ নম্বর। তাঁর ঘটনা হল, যখন তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) শহীদ হন, তখন হেজাজ তার লাশ ক্রুশে ঝুলিয়ে দেয়। ৩ দিন পর হযরত আসমা দাসীদের নিয়ে ছেলের লাশের কাছে আসেন। দেহটি উল্টো ঝুলে ছিল। তিনি (রা.) ভারাক্রান্ত চিত্তে এ দৃশ্য দেখে বলেন,

"এই অশ্বারোহীর কি ঘোড়া থেকে নামার সময় হয় নি?" কয়েকদিন পর আব্দুল মালিকের আদেশে হেজাজ লাশ নামিয়ে ইহুদীদের কবরস্থানে ছুঁড়ে ফেলে। হযরত আসমা (রা.) লাশ তুলে বাড়িতে নিয়ে আসেন এবং গোসল দিয়ে জানাযা নামায পড়েন। হযরত ইবনে যুবায়ের (রা.) এর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো অবস্থায় ছিল। গোসলের জন্য কোন অঙ্গ ওঠালে তা ছেলে হাতে চলে আসত। কিন্তু হযরত আসমা (রা.) এই অবস্থা দেখে ধৈর্য ধারণ করেন যে,এই বিক্ষিপ্ত টুকরোগুলোর উপর আল্লাহ্‌র রহমত নেমে এসেছে। হযরত আসমা (রা.) দোয়া করেছিলেন, আব্দুল্লাহ্‌র লাশ না দেখা পর্যন্ত যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। অতএব এই ঘটনার এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হযরত আসমা (রা.) ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। তখন তাঁর বয়স ছিল একশ বছর।

হযরত উম্মে আব্বান (রা.) স্বামীর অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে যান এবং মুসলমানদের সাথে মিলে রোমানদের উপর তীর বর্ষণ করেন। দামেস্কের শাসক তো কোনভাবেই পিছু হটতে প্রস্তুত ছিল না। তিনি (রা.) একজন দক্ষ তীরন্দাজ ছিলেন এবং তিনি তাক করে উক্ত ব্যক্তির চোখে তীর ছুড়েছিলেন। এতে সে চিৎকার

করে পিছন দিকে দৌড়ে পালায়। যাইহোক তখন রোমানরাও পলায়ন করে।

হযরত খানসা (রা.) বৃদ্ধ বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কাব্যিক রঙে তাঁর উত্তর উপস্থাপন করেন নি।তিনি কাদসিয়ার যুদ্ধে তাঁর পুত্রকে নিয়ে রণাঙ্গনে আসেন এবং তাদেরকে সম্বোধন করে উপদেশ দেন যে, প্রিয় পুত্রেরা! তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং হিজরত করেছ, অন্যথায় তোমরা স্বদেশের জন্য বোঝা স্বরূপ ছিলে না। আর তোমার স্বদেশে দুর্ভিক্ষও হয় নি। তদসত্ত্বেও তোমরা তোমাদের বৃদ্ধ মাকে এখানে এনে পারস্যের সামনে উপনীত করেছ। আল্লাহ্‌র কসম! তোমরা এক পিতামাতার সন্তান। আমি তোমার পিতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করি নি বা তোমার মামাকে অপমান করি নি। তোমরা জান যে, এই পৃথিবী নশ্বর এবং কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ, ধৈর্য ধারণ কর এবং ধৈর্যশীলতায় (শত্রুদের সঙ্গে) প্রতিযোগিতা কর এবং সীমান্ত রক্ষায় সদা প্রস্তুত থাক। অতএব, সকালে উঠে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও এবং শেষ পর্যন্ত লড়াই কর। সুতরাং চার ছেলে সমস্বরে চিৎকার করে মহা উৎসাহে রণ সঙ্গীত পাঠ করতে করতে কাফেরদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হযরত খানসা (রা.) ছেলেদের যুদ্ধে পাঠিয়ে জঙ্গলে চলে যান এবং দোয়া করতে থাকেন। আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলমানরা বিজয়ী হন এবং সাহাবীয়ার চার পুত্র জীবিত ফিরে আসে।

শ্রোতামণ্ডলী! হযরত উম্মে শরীক দোসিয়া (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁর উপর অত্যাচার করা শুরু করে এবং অত্যাচারের এই পন্থা অবলম্বন করে যে, তাঁকে রোদে দাঁড় করিয়ে দিত এবং প্রচণ্ড গরমে মধুর ন্যায় জিনিস খাওয়াতো এবং সামান্য পরিমাণ পানিও পান করতে দেওয়া হত না। এই সব কিছুর ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। এমতাবস্থায় তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে বলা হত। কিন্তু তিনি কিছুই বুঝতে পারতেন না। তাঁকে বোঝানোর জন্য তারা আকাশের দিকে ইশারা করত, তখন তিনি বুঝতে পারতেন যে, তারা একেশ্বরবাদকে অস্বীকার করাতে চায়। কিন্তু তিনি উত্তর দিতেন, এটি কখনই হবে না।

হযরত সাফিয়া বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মহানবী (সা.) ফুফু এবং তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রায় সমবয়সী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং বাহাদুর মহিলা ছিলেন। তিনি (রা.) অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন, আহতদের শুশ্রূষা করতেব, পানি পান করাতেন এবং প্রয়োজনে তরবারি ধারণ করতেন। ওহদ যুদ্ধে যুদ্ধের গতিপথ পাল্টে যায়। মুসলমানেরা ছত্রভঙ্গ হতে থাকে। তিনি (রা.) বর্শা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে যান এবং মুসলমানদের উৎসাহিত করে ফিরে আসতে বাধ্য করেন। এর ফলশ্রুতিতে মুসলমানেরা ফিরে আসে এবং মহানবী (সা.) কে তাঁদের আশ্রয়ে নিয়ে নেন।

আঁ হযরত (সা.) তাঁর অসীম সাহসিকতায় অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তিনি (সা.) হযরত সাফিয়া (রা.)-এর পুত্র যুবাইরকে বলেন, হে যুবাইর! তোমার মা ও আমার ফুফুর বীরত্ব তো দেখ, বড় বড় বাহাদুররা পালিয়েছে, কিন্তু তিনি একাকী পাথরের ন্যায় কাফেরদের সাথে লড়াই করছেন।

ঠিক একইভাবে যখন ওহদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর চাচা সকল শহীদের সরদার হযরত হামযা শহীদ হন এবং কাফেরা তাঁর কান, নাক কেটে ফেলে, চোখ উপড়ে নেয় এবং পেট চিরে দেয়। তখন মহানবী (সা.) যুবাইরকে নিষেধ করেছিলেন যে, আমার ফুফু সাফিয়াকে আমার চাচার মৃতদেহের কাছে যেন আসতে না দেওয়া হয়, অন্যথায় তিনি তাঁর ভাইয়ের লাশের অবস্থা দেখে দুঃখে মূর্ছা যাবেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সাফিয়া মৃতদেহের কাছে পৌঁছে যান এবং মহানবী (সা.) এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মৃতদেহ দেখে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন পাঠ করেন এবং বলেন যে, আমি একে আল্লাহ্‌র পথে কোন বড় কুরবানী কুরবানী বলে মনে করি না, অতঃপর তাঁর প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণের জন্য দোয়া করেন এবং সেখান থেকে চলে যান।

(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২)

আহযাবের যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৫৮বছর। কিন্তু তাঁর উদ্দীপনা ছিল তরুণ এবং সাহসিকতার উচ্চমার্গ প্রদর্শন করেছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গে আটকে রাখা হয়। তিনিও দুর্গে আবদ্ধ ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, একজন ইহুদী গুপ্তচর দুর্গ সম্পর্কে তথ্য নিচ্ছে। বিপদ টের পেয়ে মনে করেন,এখান থেকে তাকে আর ফিরতে দেওয়া চলবে না। তখন তিনি তাঁবুর একটি লাঠি নিয়ে উক্ত ইহুদীর মাথায় সজোরে আঘাত করেন,তার মাথা ফেটে যায় এবং সে মারা যায়। অতঃপর তরবারি দিয়ে তার শিরচ্ছেদ করে দুর্গ থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলেন। ইহুদীরা ভেবেছিল যে দুর্গের মধ্যেও সৈন্য আছে এবং তারা পালিয়ে যায়। এভাবে একজন নারীর সাহসিকতার ফলে মুসলমানরা বিরাট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

হযরত সুমাইয়া বিনতে খাব্বাত (রা.) উম্মে আম্মার (রা.) ও তার পিতা ইয়াসির (রা.) ও তার মাতা সুমাইয়া (রা.) বনী মখযুম গোত্র এত বেশি কষ্ট দিত যে, তাদের দুর্দশা পড়ে শরীরে শিহরণ অনুভূত হয়। একদা যখন এই ইসলামের প্রতি উৎসর্গশীল জামাত শরিরীক আযাবে নিপতিত ছিল, কাকতালীয়ভাবে মহানবী (সা.)ও সেই দিকে আসছিলেন। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বেদনার সুরে বলেন, صبرًا اٰلَ یَاسِرِ فَاِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّۃُ- অর্থাৎ হে ইয়াসিরের পরিবার! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। এই কষ্টের পরিবর্তে খোদা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। অবশেষে এই যন্ত্রণায় ইয়াসির (রা.) শহীদ হয়ে যান এবং অত্যাচারী আবু জাহেল বৃদ্ধা সুমাইয়ার উরুতে এমন নৃশংসতার সাথে একটি বর্শা নিক্ষেপ করে যে তা কেটে গোপনাঙ্গ ভেদ করে বের হয়ে যায় এবং এই নিরীহ মহিলাটি সেই স্থানেই যন্ত্রণায় ছটপট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

পরিশেষে হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর কনিষ্ঠ কন্যার কথা উল্লেখ করব। তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)বলেন, ফাতেমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌ সন্তুষ্ট হন এবং ফাতেমার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌ অসন্তুষ্ট হন... ফাতেমা এই উম্মতের নারী, সমস্ত বিশ্বের নারী, জান্নাতে প্রবেশকারী নারী এবং ঈমানদার নারীদের নেত্রী।

(আজওয়াজে মুতাহারাত ওয়া সাহাবীয়াত, পৃ: ২৯২-২৯৩)

অনুরূপভাবে তিনি (সা.) বলেন, "ফাতিমা আমার শরীরের একটি অঙ্গ, যে তাকে কষ্ট দিয়েছে সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।"

(তাযকারে সাহাবীয়াত, পৃ: ১৪৩)

তিনি মহানবী (সা.) এর সবচেয়ে প্রিয় সন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁর আদরের মেয়েকে যৌতুক হিসেবে যে জিনিসগুলো দিয়েছিলেন তা হল, পাটের তৈরী চারপাই, তুলোর পরিবর্তে খেজুর পাতায় পূর্ণ চামড়ার গদি, একটি নুপুর, দুটি মাটির পাত্র, একটি পানির মশক এবং দু'টি জাঁতা। যদিও তখন সচ্ছলতার দিন আগত হয়েছিল। তথাপি আঁ হযরত (সা.) তাঁর প্রিয় কন্যাকে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়ার জন্য এমন প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, তিনি (রা.) বাড়ির সমস্ত কাজ নিজেই করতেন। জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে হাতে ফোসকা পড়ে যেত। জল ভরতে ভরতে বুকে ব্যাথা হত। একবার হযরত ফাতিমা (রা.) রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে ঘরের কাজের জন্য একজন দাসী প্রদান করতে অনুরোধ করলে মহানবী (সা.) তাঁকে দাসী প্রদানের পরিবর্তে নামাযের পর তসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করার উপদেশ দেন। অতএব তিনি (রা.) এর উপর আমল করতে শুরু করেন।

একবার কোন হতভাগ্য ব্যক্তি মহানবী (সা.) -এর মাথায় ধুলোবালি ফেলেছিল। রসুল করীম (সা.) বাড়ি ফিরে আসেন। তাঁর (সা.) কলিজার টুকরো হযরত ফাতিমা (রা.) মহানবী (সা.) এর ধূলিধূসরিত মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন এবং সেই সাথে ক্রমাগত কেঁদে যাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, আমার প্রাণের প্রিয় কন্যা! কান্নাকাটি করো না। আল্লাহ্‌ তোমার পিতার হেফাজতকারী।

(আহলে বাইত রসুল সা. পৃ: ২৭৭-২৭৮)

হযরত ফাতিমা (রা.) আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে যোগ দিতে এবং তাঁর সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত ফাতিমা (রা.) আঁ হযরত (সা.) কে গভীর ভালবাসতেন। আঁ হযরত (সা.) এর মৃত্যুপর হযরত ফাতেমা (রা.) কখনও হাসেন নি। আঁ হযরত (সা.) এর মৃত্যুর ৬ মাস পর তিনিও মৃত্যু বরণ করেন। মাত্র ২৯ বছর।

শ্রোতামণ্ডলী! আমার ইচ্ছে করছে এই প্রিয় সাহাবীয়াদের স্মৃতিচারণ অব্যাহত রাখতে। আল্লাহ্‌ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন যে, আমরা তাদের এই স্মৃতিতে কেবল সাময়িকভাবে নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন অনুভব না করি,বরং এই সাহাবীয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) মহিলাদেরকে সাহাবীয়াদের উদাহরণ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে বলেন-

আপনারা নিজেদের মর্যাদাকে অনুধাবন করুন এবং নিজেদের মধ্যে নতুন উদ্যম ও নতুন জীবন তৈরী করার চেষ্টা করুন। আপনাদের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের উন্নতির জন্য অফুরন্ত সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) কে অনুকরণ করার চেষ্টা করুন, হযরত হাফসা (রা.) কে অনুকরণ করার চেষ্টা করুন, হযরত জয়নব (রা.) কে অনুকরণ করার চেষ্টা করুন। আপনারাও সেই সাহাবীয়াদের অনুকরণ করার চেষ্টা করুন যাঁরা তাঁদের সময়ে অনেক বড় বড় কাজ করেছেন।

১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে জার্মানী এক বক্তৃতায় মহানবী (সা.)–এর পবিত্র সহধর্মিনীদের পবিত্র জীবন চরিত বর্ণনা করার পর খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন-

আল্লাহ্‌ তা'লা আপনাদের এই কথাগুলো শুনে সেগুলোকে আপনাদের হৃদয়ে স্থান করে দেওয়ার তৌফিক দান

মহানবী (সা.)-এর বাণী

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ

কর্ম নির্ভরশীল উদ্দেশ্য তথা সংকল্পের উপর।

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

করুন। এই কথাগুলো আপনাদের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করবে, আপনাদের জন্য বিভিন্ন নমুনা প্রতিষ্ঠা করবে এবং উক্ত নমুনাগুলোকে আপনারা নিজেদের জন্য আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করুন যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে,

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

(আল বাকারা: ১৪৯)

অর্থাৎ-

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহিলা সাহাবীয়াদের পদমর্যাদা ও ত্যাগের ভূমিকা উল্লেখ করে বলেন-

এগুলো সেই মান যা আমাদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে যাতে ইসলামের পুনর্জাগরণের যুগে আমরা আমাদের দায়িত্বাবলী পালন করতে সক্ষম হই। এগুলি নিছর শোনার জন্য কোন কল্প কাহিনী নয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এই উদাহরণগুলিকে অবশ্যই জীবনের একটি অংশে পরিণত করতে হবে। ইবাদত, নবী প্রেম, আর্থিক ও জীবন উৎসর্গের মান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিঃসন্দেহে, আহমদী মহিলারা কুরবানীর মান প্রদর্শন করছেন, কিন্তু বিশেষ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী মহিলারা নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করুন এবং যাদের স্বামীরা বাধার কারণ হয় তাদের বলুন যে, আমরা ধর্মের বিষয়ে আপনার কথা শুনব না। আর যতদূর ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গের সম্পর্ক সেক্ষেত্রে আহমদীয়া জামাত প্রাণ উৎসর্গের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে চলেছে। আর এটাই মায়েদের প্রশিক্ষণের প্রভাব। পুরুষদের কুরবানীর পুণ্য তাদের মায়েরা পেয়ে থাকেন।. সর্বদা মনে রাখবেন দাজ্জাল শয়তানী কৌশলের জাল বিস্তার করে রেখেছে। আজ যেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তা হল, ইবাদত ও রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধির চেষ্টা করা। সন্তান-সন্ততির শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। তাদের অন্তরে এটি স্থাপন করুন যে, তারা যেন সর্বদা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দান করে। নিজেদের দোয়াতে এ পরিমাণ জোর দিন ও যাতনা সৃষ্টি করুন যে, আল্লাহর রহমত উদ্বেলিত হয় এবং আমাদের সন্তানেরা পার্থিব কামনা-বাসনার বশবর্তী হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর ধর্ম শেখার, আল্লাহ্‌র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার এবং রসুল (সা.)-এ প্রেমিকে পরিণত হওয়ার আকাঙ্খী হয়ে ওঠে।

আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদী মহিলাকে এই মান অর্জন করার তৌফিক দান করুন। আজ, এই দিকে নারীদের মনোযোগ পুরুষদের সংস্কারের পথকে প্রশস্ত করবে। আল্লাহ্ করুন,আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে একত্রিত হয়ে প্রকৃত সত্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকারীতে পরিণত হোক যা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন। আমীন।

(মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ, জলসা সালানা ইউকে,২৯ শে জুলাই, ২০২৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল আহমদী নারীদেরকে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর দিকনির্দেশনাগুলি পালন করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সেই সকল পবিত্র আত্মা সাহাবীয়াদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ করুন এই উদাহরণ এই উদাহরণগুলি আহমদী মহিলাদের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হোক এবং আমরাও প্রথম যুগের মহিলাদের ন্যায় সকল প্রকার ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকি।

অবশ্যই মহানবী (সা.) এর সকল সাহাবী নক্ষত্রের ন্যায়,

তাঁদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল জ্যোতিতে জোতির্ময়।

হে প্রভু! আমাদের নবী (সা.) এর সকল সাহাবীর প্রতি করুণা বর্ষণ কর, এবং তাদের সঙ্গে ক্ষমাসুলভ আচরণ কর এবং তুমিই আল্লাহ্ মহান সম্মানের অধিকারী।

২ পাতার পর.....

সমাহার।..... অর্থাৎ তা ভারসাম্যপূর্ণ মুহাম্মদী প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে অবতীর্ণ হয়েছে, যাতে না মুসায়ী প্রকৃতির কঠোরতা আছে, না খ্রিস্টীয় স্বভাবের কোমলতা, বরং রয়েছে কঠোরতা ও কোমলতা এবং ক্রোধ ও অনুকম্পার এক অপূর্ব সমন্বয়। .....এসব বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'লা অন্যত্রও বলেছেন, اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (সূরা আল্ কলম: ৫)। অর্থাৎ হে নবী! তুমি মহান চারিত্রিক গুণাবলীর সমন্বয়ে সৃষ্ট ও গঠিত অর্থাৎ স্বীয় সত্তায় সকল সম্মানজনক চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীতে এতটা সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ যে, এর অধিক আর কিছু কল্পনাই করা যায় না।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৩ এর ১১ নম্বর টিকা)

মহানবী (সা.)-এর হৃদয়কে খোদা তা'লা স্বচ্ছ আয়নার সাথে তুলনা করেছেন, যাতে কোন প্রকার পঙ্কিলতা নেই। এটি হৃদয়ের জ্যোতি। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর বোধবুদ্ধি ও চেতনা, সুস্থ বিবেক এবং প্রকৃতিগত ও সহজাত সকল উন্নত নৈতিক চরিত্রকে এক অতি উন্নত মানের তেলের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যাতে রয়েছে প্রভূত ঔজ্জ্বল্য এবং যা প্রদীপের আলোর উৎস। এ হলো বিবেকের আলো। কেননা অভ্যন্তরীণ সব সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের উৎসস্থল হলো যুক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তি।

এসব আলোর ওপর একটি স্বর্গীয় আলো অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, তাহলো ওহীর আলো। তিন প্রকারের আলো সম্মিলিতভাবে মানুষের হিদায়াতের কারণ হয়েছে। এটিই ঐশী নীতি ও রীতি, যা চিরপবিত্র সত্তার পক্ষ থেকে চিরন্তন রীতি আর তাঁর পবিত্র সত্তার জন্য এটিই মানানসই।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৭ এর ১১ নম্বর টিকা)

বদান্যতা, উদারতা, দানশীলতা, ত্যাগতিতীক্ষা, মানবিকতা, বীরত্ব, তাকওয়া, অল্পে তুষ্টি ও জগত বিমুখতা সংক্রান্ত নৈতিক গুণাবলী মহানবীর পবিত্র সত্তায় এমনভাবে দেদীপ্যমান, প্রদীপ্ত ও সমুজ্জ্বল ছিল যে, কেবল ঈসা (আ.)-ই নন, বরং মহানবী (সা.)-এর পূর্বে পৃথিবীতে কোন এমন নবী অতিবাহিত হন নি যার চরিত্র এমন পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় দেদীপ্যমান ছিল। কেননা মহানবী (সা.)-এর জন্য খোদা তা'লা অশেষ ধনভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়েছেন আর তিনি (সা.) এর পুরোটাই খোদার পথে ব্যয় করেছেন। এর কোন একটি শষ্য-দানাও নিজের আরাম ও বিলাসিতার জন্য ব্যয় করেন নি। কোন বাসস্থান নির্মাণ করেন নি, আর কোন অট্টালিকাও বানান নি, বরং ছোট্ট একটি মাটির ঘরে নিজের পুরোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, যা গরীবদের কুটিরের চেয়ে উত্তম কিছুছিল না। দুর্ব্যবহারকারীদের সাথে তিনি সদ্ব্যবহার করে দেখিয়েছেন। যারা ছিল তাঁর মর্মযাতনার কারণ। তাদের কষ্টের সময় নিজের সম্পদের মাধ্যমে তাদেরকে সুখ পৌঁছিয়েছেন। শোওয়ার বিছানা প্রায়শ তিনি (সা.) মাটিতে পাততেন, বসবাসের জন্য ছিল একটি ছোট্ট ঝুপড়ি ঘর আর খাওয়ার জন্য নির্ভর করতেন ভুট্টার রুটির ওপর কিংবা অনাহারে থাকতেন। জাগতিক ধনসম্পদ তাঁকে অঢেল দেয়া হয়েছে, কিন্তু মহানবী (সা.) জাগতিকতার মাধ্যমে নিজের পবিত্র হাতগুলোকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করেন নি। দারিদ্র্যকে সর্বদা সমৃদ্ধির ওপর, আর দীনতাকে প্রাচুর্যের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর আবির্ভাবের দিন থেকে প্রিয় বন্ধুর সাথে মিলিত হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি স্বীয় মহা-মহিম প্রভুছাড়া আর কারো পরোয়া করেন নি। শতভাগ খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সহস্র সহস্র শত্রুর মোকাবেলায় রণাঙ্গনে দণ্ডায়মান হয়ে স্বীয় বীরত্ব, বিশ্বস্ততা ও অবিচলতা দেখিয়েছেন, যেখানে মৃত্যুর সমূহ আশঙ্কা ছিল। এক কথায়, বদান্যতা ও উদারতা, জগতের প্রতি অনীহা, অল্পে তুষ্টি, পৌরুষ, বীরত্ব ও খোদাপ্রেম-সংক্রান্ত যেসব মহান চারিত্রিক গুণাবলী রয়েছে, তা-ও সম্মানিত খোদা মহানবীর মাঝে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে কখনও প্রকাশিত হয় নি আর ভবিষ্যতেও প্রকাশ পাবে না।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯ এর ১১ নম্বর টিকা)

প্রকৃত অর্থে কোন নবীই মহানবী (সা.)-এর সমপর্যায়ের পবিত্র আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার হতে পারে না, বরং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে কারো কোন সামঞ্জস্য থাকা তো দূরের কথা, সব ফিরিশতারও সম্মিলিতভাবে এক্ষেত্রে তাঁর সমকক্ষতার দাবি করার সুযোগ নেই। কিন্তু হে সত্যান্বেষী! খোদা তোমায় হিদায়াত দান করুন, তুমি মনোযোগ সহকারে একথা শ্রবণ কর যে, এই প্রিয় রসূলের কল্যাণরাজি প্রকাশ করা চিরকাল অব্যাহত রাখার জন্য আর তাঁর জ্যোতি ও গ্রহণীয়তার উৎকৃষ্ট কিরণমালা যাতে বিরোধীদেরকে অভিযুক্ত ও নির্বাক করতে থাকে, এর জন্য তিনি স্বীয় পরম প্রজ্ঞা ও করুণায় এই ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার যারা পরম বিনয় ও নম্রতার সাথে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে আর বিনয়ের আস্তানায় পড়ে সম্পূর্ণভাবে অবাধ্য প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে, তাদেরকে খোদা এক স্বচ্ছ কাঁচের ন্যায় পেয়ে তাদের লৌকিকতামুক্ত সত্তার মাধ্যমে নিজ প্রিয় রসূলের কল্যাণরাজি প্রকাশ করেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের যে প্রশংসা করা হয় বা তাদের মাধ্যমে যেসব লক্ষণাবলী ও কল্যাণরাজি এবং নিদর্শনাবলী প্রকাশ পায়, প্রকৃতপক্ষে এসব প্রশংসার পূর্ণ দাবিদার এবং এ সমস্ত কল্যাণের পূর্ণ উৎসস্থল হলেন মহানবী (সা.)। প্রকৃত ও সম্পূর্ণরূপে সে সমস্ত প্রশংসা তাঁকেই শোভা পায়। তিনি এসবের পূর্ণ সত্যায়নকারী ও সত্যায়নস্থল।

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৮ এর ১১ নম্বর টিকা)

যেহেতু আঁ হযরত (সা.) বাতেনী পবিত্রতায়, হৃদয়ের প্রসারতায়, নিষ্পাপ হওয়ায়, নম্রতায়, সততায়, বিশ্বস্ততায়, এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতায়, কৃতজ্ঞতায় এবং ভালবাসায়, প্রভৃতি সমস্ত ক্ষেত্রেই সকল নবীদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা উত্তম এবং উন্নত এবং পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল এবং স্বচ্ছ ছিলেন; সেহেতু আল্লাহ্ জাল্লাহু শানুহু তাঁকে বিশেষ উৎকর্ষতার আতর দিয়ে সবার চাইতে বেশী করে অভিষিক্ত করেছেন। এবং সেই বক্ষ ও হৃদয়, যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বক্ষ ও হৃদয় থেকে অধিক প্রসারিত এবং পবিত্র এবং নিষ্পাপ ও আলোকিত ও প্রেমিক ছিল, তাকে এরূপ উপযুক্ত বলে সাব্যস্ত করা হলো যে, তার উপর এমন ওহী নাযেল হলো যা সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তীগণের ওহী থেকে অধিকতর শক্তিশালী এবং পূর্ণ এবং উন্নত এবং উত্তম। এবং সে কারণেই তা ঐশী গুণাবলী প্রদর্শনের নিমিত্তে এক স্বচ্ছ-সুনির্মল এবং প্রশস্ত ও বৃহদাকার আয়না হয়ে গেল। সুতরাং এটাই সেই কারণ, যে জন্য কুরআন শরীফে যে পূর্ণতা ও উৎকর্ষতা বিদ্যমান তার সামনে পূর্ববর্তী কেতাবগুলির দীপ্তি নিভু নিভু হয়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

(সুরমা চাশমা আরিয়া, পৃ: ৭১)

হজ্জাতুল বিদার খুতবার আলোকে আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনী

(সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা)

মূল–মহম্মদ ইনাম গৌরী, নাযির আলা, কাদিয়ান

يَآ يُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍوَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً۔

অনুবাদ: হে মানবমন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রভুর তাকওয়া অবলম্বন কর। যিনি তোমাদিগককে একই আত্ম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহা হইতে উহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উভয় হইতে বহু নর নারী বিস্তার করিয়াছেন। (সূরা নিসা:২)

يَآ يُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔

অনুবাদ: হে মানবমন্ডলী! নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে পুরুষ ও নারী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি যেন তোমরা একে অপরকে চিনিতে পার। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক মুত্তাকি। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী ও পুরোপুরি অবহিত।

(আল হুজরাত-১৪)

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ۔ (كهف:111)

অনুবাদ: হে মহম্মদ (সা.)! তুমি বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ, (কিন্তু) আমার প্রতি এই ওহী করা হয় যে, তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ। (সুরা কাহাফ, আয়াত: ১১১)

ইসলামিক সাম্যের দর্শনের সারাংশ কুরআনের এই কয়েকটি আয়াতে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে যেগুলি এখনই আমি তেলাওয়াত করলাম এবং এর অনুবাদ শোনালাম।

সূরা নিসার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতির চিরন্তরন ও চিরস্থায়ী সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পৃথিবীতে প্রকৃত সাম্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন যে তারা সবাই একই পিতার সন্তান এবং একই গাছের শাখা প্রশাখা এবং এই নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরবর্তী পরিস্থিতির ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষ এবং বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যতই মতভেদ সৃষ্টি হোক না কেন, তাদের পারস্পরিক বিষয়ে এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। তবে তারা তাদের উৎপত্তির দিক থেকে একই দম্পতির বংশধর।

আর সূরা হুজরাতের আয়াতে তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, মানব সমাজে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্রের বিভাজন দেখা যায় এটি কেবলমাত্র পরিচয় এবং পরিচয়ের একটি মাধ্যম। এই বিভক্তিকে একে অপরের বিরুদ্ধে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি করার কারণ বানাবেন না। এবং স্মরণ রাখবেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট বরং নেক (ধার্মিক) সমাজেও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত ব্যক্তি সেই ব্যক্তি যিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী এবং অধিক নেক ও অধিক পুণ্যবান।

মুহসিনে ইনসানিয়্যত (মানবতাবাদী) হযরত আকদস মোহাম্মদ (সা.) ঘোষণা দিয়ে বলেন যে, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ স্মরণ রাখবে! আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ এবং মানবতার সম্মানকে পরম মার্গে পৌছে দিয়েছে।

শ্রোতাবৃন্দ! বিশ্ব আজ নিরাপত্তাহীনতা ও উদ্বেগে ভুগছে। এর প্রধান কারণ ধর্মীয় বিদ্বেষ, দ্বিতীয়ত জাতিভেদ এবং বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য। কখনও শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কখনও পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কখনও জাতিগত আধিপত্যের দাবি, আবার কখনও উচ্চতর বর্ণের মায়া যা অন্য মানুষকে নিকৃষ্ট ও অবজ্ঞার চোখ দেখায় এবং এইভাবে মানুষ মানুষের মধ্যে বিদ্বেষের একটি লৌহ প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই পটভূমিতে আজ সর্বত্র সাম্য ও সমতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। কার্যত সবুজ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা কতটুকু সম্ভব হয় এবং কতটুকু সম্ভব হয়েছে এবং বাস্তবতা কি চিত্র তুলে ধরছে তা এই স্বল্প সময়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে ঘোষণা ও অপপ্রচার অস্বীকার করা যাবে না। উন্নত দেশগুলির পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠার স্বাগত ঘোষণা রয়েছে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হোক বা সমাজতন্ত্র বা সমবায় ব্যবস্থা, সকলেই সাম্য ও সমতার দাবি করে। যেমন ধনী গরিবের পার্থক্য মুছে দিতে হবে। নারী পুরুষের মধ্যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শাসক ও প্রজা, মালিক (কর্তা) ও শ্রমিককে এক সারিতে দাঁড় করাতে হবে ইত্যাদি।

যেখানে বাস্তবে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোন বিষয়ে মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদি করা যায় তাহলে কতটুকু করা যায়।

এর জন্য আমাদেরকে আল্লাহ্ যিনি প্রকৃত স্রষ্টা তাঁর মৌলিক গুণাবলী রবুবিয়্যত বা প্রভুত্ব, রহমানিয়্যত বা করুণা বা অনুগ্রহ, রহিমিয়্যত বা দয়ালু এবং মালকিয়্যত বা মালিক, ইয়াও মিদ্দীন বা বিচার দিবসের মালিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। কেবল প্রথম গুণাবলীকে নিয়ে নিন যে কোরআন করীম আল্লাহ তা'লাকে রাব্বুল আলামীন বা জগতসমূহের প্রতিপালক আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ সমস্ত জগতের সকল সৃষ্টির পালনকর্তা ও প্রভু। তিনি কেবল মুসলমানদের বা খৃষ্টানদের বা ইহদী ও নাসারাদের রব বা প্রভু নন। তাঁর স্বর্গীয় ব্যবস্থা এবং পার্থিব ব্যবস্থা প্রত্যেক মানুষকে তাঁর প্রভুত্ব ও করুণার গুণাবলীর অধীনে সমান অনুগ্রহ করেছে। তা নির্বিশেষে একজন ব্যক্তি এই খোদাকে বিশ্বাস করুক বা না করুক, তাঁর সূর্য, তাঁর চন্দ্র সবাইকে আলো দিচ্ছে। তাঁর ভূমি, তাঁর নদী, তাঁর বাতাস সব কিছু নির্বিশেষে সকলকে অনুগ্রহ করছে।

এগুলো শারিরীক বৃদ্ধি ও বিকাশের উপায় ও উপকরণ। একইভাবে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ও উন্নতির ক্ষেত্রে খোদাতা'লা কোন জাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করেন নি। প্রত্যেক জাতিতে তিনি তাদের রসুল ও পথপ্রদর্শক প্রেরণ করেছেন। যেমনটি কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ (সূরা ইউনুস: ৪৮) এবং وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (সূরা রাআদ:৮) ইত্যাদি এর সাক্ষী আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যিনি রব্বুল আলামীন জগতসমূহের প্রতিপালক প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক উম্মতে পথপ্রদর্শক ও রসুল প্রেরণ করেছেন। এবং ঐ সমস্ত নবীদের মধ্যেও সমতা বজায় রেখেছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'লা ঘোষণা দিলেন لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ অ থ ॑ া ৎ আমরা মুসলমানেরা খোদার নবীগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না অর্থাৎ নবুয়্যতের দিক থেকে সবাই সমান। হ্যাঁ, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এবং পরিধির দিক থেকে তাদের পদমর্যাদার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! এখন আমি মানুষের সৃষ্টি অর্থাৎ জন্ম ও তদের মানসিক ও শারিরিক সক্ষমতা সম্পর্কে তাদের অধিকার ও কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমতার দিকে খুব বেশি না গিয়ে সাইয়্যেদানা হযরত আকদদস মুহাম্মদ মুস্তফা (স.)-এর বিজয়ী হজ্জের খোতবার আলোকে কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

স্মরণ রাখবেন যে, সৈয়্যদানা হযরত আকদস মুহাম্মদ (সা.) ৯ম হিজরীতে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করেন। বর্ণনা অনুযায়ী এক লক্ষ চব্বিশ হাজারেরও বেশি সাহাবা এতে অংশ নিয়েছিলেন। এটি ছিল মহানবী (সা.) এর প্রথম ও শেষ হজ্জ। যা বিদায় হজ্জ নামে পরিচিত। এতে রসুলুল্লাহ্ (সা.) আরাফাত ও মিনার ময়দানে দীর্ঘ খোতবা প্রদান করেন যা বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মাধ্যমে বুখারী শরীফ ও মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এই খোতবা মৌলিক মানব কল্যাণ সম্পর্কে এবং এতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমি আমার বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র মানবিক সাম্যের দিকটি বিবেচনা করে আমি এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ খোতবার কয়েকটি অনুচ্ছেদের অনুবাদ উপস্থাপন করছি।

১১ই যিল হজ্জ মিনার ময়দানে আঁ হযরত (সা.) খোতবা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, 'হে লোক সকল! আমার কথাগুলো ভালভাবে শোনো কারণ আমি জানি না যে এই বছরের পর আমি তোমাদেরমাঝে এইখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করব কি না।"

" হে লোকসকল! তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতাও এক ছিলেন। সুতরাং সাবধান এবং শোন! অ-আরবদের উপর আরবদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং আরবদের উপর অ-আরবদের কোন কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অনুরূপভাবে কৃষ্ণাঙ্গের উপর লাল ও সাদা মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং সাদা মানুষের উপর কালো মানুষের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে যে তার ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য এগিয়ে যায় সে সর্বোত্তম।"

পুনরায় বলেন, "হে মুসলমানগণ! ঈমানের মাধ্যমে খোদা তা'লা তোমাদের থেকে অজ্ঞতার যুগের অযথা অহংকার ও অভিমান এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কারণে অনর্থক রোগ ব্যধি দূরকরে দিয়েছেন।....... স্মরণ রাখবেন সকল মানুষ আদমের বংশধর এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি।"

তিনি আরও বলেন, "পৃথিবীর মানুষ খনিজ পদার্থের মত, যেগুলি একই উপাদান এবং একই মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে তারা বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে কিন্তু শুনুন প্রগতি ও মহত্বের সুপরিচিত প্রতীকগুলি যা ইসলামের পূর্বে অজ্ঞতার যুগে প্রচলিত ছিল। (অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞা, প্রতিরোধ ও সাহসিকতা শক্তি এবং প্রভাব ইত্যাদি) এখনও প্রতিষ্ঠিত। আর এসব গুণের কারণে জাহেলিয়াতের যুগে যাদেরকে মহান বলে গণ্য করা হতো তারা এখন ইসলামে মহান বলে বিবেচিত হবে। তবে শর্ত হলো তারা যেন দ্বীনি জ্ঞান ও ব্যক্তিগত পুণ্য অর্জন করে।"

তিনি আরও বলেন:'হে লোক সকল! তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের কিছু অধিকার রয়েছে এবং তোমাদের স্ত্রীদেরও কিছু অধিকার

রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল তারা যেন সতীত্ব ও পবিত্রতার সহিত জীবনযাপন করে এবং এটা তোমাদের দায়িত্ব যে তুমি তোমার অবস্থা অনুযায়ী তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা। এবং স্মরণ রাখবে আপন স্ত্রীদের সহিত সর্বদা ভালো ব্যবহার করবে কারণ সর্বশক্তিমান খোদা তোমাকে তাদের যত্নের দায়িত্ব দিয়েছেন। তুমি যখন তাদের সহিত বিয়ে করেছিলে তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহকে তাদের অধিকারের নিশ্চয়তাদানকারী বানিয়েছিলে। এবং সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার আইনের অধীনে তুমি তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলে। সুতরাং মহান খোদা তা'লার আইনকে অবজ্ঞা করবে না এবং নারীর অধিকার আদায় করার প্রতি সর্বদা যত্নবান থাকবে। "

পুনরায় তিনি বলেন: " হে লোক সকল! তোমাদের হাতে এখনও কিছু যুদ্ধবন্দী আছে। আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা নিজেরা যা খাবে তাই তাদের খাওয়াবে এবং তাদের তাই পরাবে যা তোমরা পরবে। যদি তারা এমন কোন দোষ করে যা তোমরা ক্ষমা করতে পারবে না তাহলে তাদেরকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দাও, কেননা তারা খোদা খোদা তা'লার বান্দা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়।"

তিনি (সা.) আরও বলেন:

"হে লোকসকল! প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, তোমরা সবাই একই পদমর্যাদার। তোমরা সবাই মানুষ যেই জাতির হও যেই মর্যাদার হও, মানুষ হওয়ার জন্য মর্যাদার দিক দিয়ে সবাই সমান। এই কথা বলতে বলতে তিনি (সা.) নিজের দুটি হাতওঠালেন এবং দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকেক এক সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন এবং বললেন, যেমন, দুই হাতের আঙ্গুলগুলি সমান সমান ঠিক তেমনই মানব জাতি পরস্পর সমান। তোমাদেরকে একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা প্রদর্শন করার কোন অধিকার নেই। তোমরা ভাইয়ের মত।"

তিনি আরও বলেন:

"তোমরা কি জান এটি কোন মাস? তোমরা কি জান এটি কোন এলাকা? তোমরা কি জান এটি কোন দিন? লোকেরা বলল, হ্যাঁ! এটি হল পবিত্র মাস, এটি পবিত্র এলাকা এবং এটি হজ্জের দিন। প্রত্যেকটি উত্তরে রসুল করীম (সা.) বললেন, যেমন এই মাসটি পবিত্র,যেমন এই এলকাটি পবিত্র,যেমন এই দিনটি পবিত্র, একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক মানুষের জীবন ও সম্পদকে পবিত্র ও হারাম ঘোষণা করেছেন। এই আদেশ আজকের জন্য নয়। আগামীকালের জন্য নয় বরং সেই দিনের জন্য যেদিন তোমরা খোদার সঙ্গে দেখা করবে। (সেই দিন পর্যন্ত)

পুনরায় তিনি বলেন,

"আজ আমি তোমাদের যে কথাগুলি বলছি এই সব (কথাগুলি) পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দাও কারণ এটা সম্ভব যে আজ যারা আমার কথা শুনছে তাদের চেয়ে যারা আমার কথা শুনছে তারা এদের থেকে বেশি অনুসরণ করবে।"

(বুখারী,কিতাবুল মাগাযি, বাব হাজ্জাতুল বিদা)

এই খুতবা বিভিন্ন বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন গ্রন্থে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। এইটি বর্ণনাতে এইভাবে এসেছে যে, আঁ হযরত (সা.) যখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, এটি কোন মাস তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল ভাল জানেন এবং আমরা ভাবলাম যে আপনি হয়তো এই মাসটির অন্য নাম রাখবেন। তখন তিনি (সা.) নিজেই উত্তর দিলেন যে, এটি কি পবিত্র মাস নয়?

তবে বর্ণনার ভিন্নতা যাই হোক না কেন, ঐতিহাহিস ও ইতিহাস রচনাকারী এই খুতবায় মানবতাবাদী হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয় সম্পর্কিত নির্দেশাবলীকে আগে পৌঁছে দেওয়অর নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশাবলী কেবলমাত্র অস্থায়ী এবং একটি এলাকার জন্য সীমাবদ্ধ থাকার জন্য নয় বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের জন্য নির্দেশিকা রয়েছে। এর সারমর্ম হল এই যে,

১) প্রথমত, সমস্ত মানবজাতির এই নীতিটি বিবেচনা করা উচিত যে, সমস্ত মানবসমাজ একই সত্তা থেকে সৃষ্ট এবং একই পিতার বংশধর এবং একই গাছের শাখা প্রশাখা তাই মানবতার দিক থেকে সকল মানুষ সমান।

২) এই জাতিগত ঐক্যের পরও এটা সম্ভব। যেমন ভূগর্ভ থেকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ বের হয়, কয়লা, লোহা, তামা, সোনা ইত্যাদি বের হয়। একইভাবে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা ও প্রতিভা এবং কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফলে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট ও স্বতন্ত্রের উদ্ভব হতে পারে কিন্তু এই স্বতন্ত্র ও পার্থক্যের কারণে একটি জাতি বা একটি গোত্র বা ব্যক্তি অন্য জাতি বা গোত্র বা ব্যক্তিদের উপর অযথা গর্ব ও অহংকার করা উচিত নয়।

৩) মুসলমানরা এই অর্থে যে তারা এক নবীর উম্মত এবং একই ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তারা একই আধ্যাত্মিক পিতার সন্তান, তাই তাদের ভাই হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। যেমন মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, اِنَّمَا الۡمُؤۡمِنُوۡنَ اِخۡوَةٌ অর্থাৎ নিশ্চয় মোমেনগণ পরস্পর ভাই ভাই।

(আল হুজরাত: ১১)

৪) সমাজে কিছু দুর্বল ও দরিদ্র লোকও আছে যারা মর্যাদাবান ও সম্ভ্রান্তদের সেবক হিসেবে কাজ করে। অথবা যুদ্ধে পরাজিত জাতি থেকে অনেক লোক বিজয়ী জাতির নিয়ন্ত্রণে আসে,তাদের সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) এমন নির্দেশ জারি করেছেন যা আজকের সভ্য বিশ্বে বিস্ময়ের সাথে দেখা ও শোনা যায় যে, দাস ও বন্দীদেরকেও মালিকের সমান ঘোষনা করা হয়েছে, যদিও দাস ও বন্দীরাও মানুষ, তাই তাদের খাদ্য ও বস্ত্রের যত্ন নেওয়া এবং তাদের সামর্থের বাইরের কাজ না নেওয়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৫) আজকাল নারী-পুরুষের সমতা একটি বড় সমালোচনার কারণ হয়েছে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দিন দিন আপত্তি উঠছে যে, ইসলাম নারীদেরকে পুরুষদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে নারীদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে এবং পর্দার মধ্যে বাড়িতে বন্দী করে রেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মহানবী (সা.) তাঁর খুতবায় নারীদের প্রতি যত্নবান থাকা এবং তাদের অধিকার প্রদানের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর পবিত্র কুরআন নারী ও পুরুষের সৃষ্টির পার্থক্যকে সামনে রেখে নারীদেরকে যে পরিমাণ সম্মান প্রদান করেছে এবং তাদের অধিকার, আবেগ অনুভূতিকে যে পরিমাণে সুরক্ষিত করেছে, পৃথিবীর কোন সমজ বা কোন ধর্মই তার উদাহারণ পেশ করতে পারে না। এটি একটি পৃথক কোন স্থায়ী বিষয় বা এখানে বিস্তারিত বর্ণনা করার সময় ও সুযোগ নেই।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আসল সমস্যা হল মানবতার সমতা প্রতিষ্ঠার দাবি করা হয়, কিন্তু কোন বিষয়ে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে তা দেখা হয় না যতদূর মানুষত্বে ও মানবতার সম্পর্ক সব মানুষই সমান। প্রতিটি মানুষের দুটি চোখ, দুটি কান, দুটি পা, জিহ্বা, নাক, হৃৎপিন্ড, মস্তিষ্ক ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তা সব মানুষকে দান করেছেন। ইল্লা মাশাআল্লাহ্ তা ছাড়া কিছু প্রতিবন্ধীও আছে।

কিন্তু এই সব কিছু মানুষের অধিকার প্রদানে সমতা প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক দায়িত্ব। এই বিষয়ে স্মরণ রাখতে হবে যে, মানবাধিকার দুই প্রকার।

১)একটি হল সরকার যে অধিকারগুলির জন্য দায়ী সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوۡعَ فِيۡهَا وَلَا تَعۡرٰى. وَاَنَّكَ لَا تَظۡمَؤُا فِيۡهَا وَلَا تَضۡحٰى. (سورۂ طٰہٰ:119-120)

অর্থাৎ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের লক্ষণ হল যে, (হে লোকসকল) নিশ্চয় ইহাতে তোমাদের জন্য (বিধি ব্যবস্থা) রহিয়াছে যে, তুমি ইহাতে ক্ষুধার্ত থাকিবে না এবং উলঙ্গও থাকিবে না এবং ইহাতে তৃষ্ণার্ত থাকিবে না এবং রৌদ্রেও পুড়িবে না। (সূরা তাহা-১১৯-১২০)

তাই এটি পরিচালনা করা প্রতিটি সরকারের মৌলিক দায়িত্ব যে দেশের ও জাতির কোন মানুষ ন্যুনতম প্রয়োজনে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

একইভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং জাতীয় পদে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের নিয়োগ করা এবং বাধ্যতামূলক কর ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদের যথাযথ বন্টন পরিচালনা করা, এইগুলি সরকারের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

অন্যান্য অধিকারগুলি হল যা প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিকভাবে অর্জিত হয়। যেমন শারীরিক ক্ষমতা ও মানসিক ক্ষমতা ইত্যাদি বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও সংগ্রামের ফলে অর্জিত হয়।

ইসলাম উপযুক্ত উপায়ে এই ধরণের ব্যক্তি অধিকারে হস্তক্ষেপ করে বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্যের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা কমিউনিজমের মত জোরপূর্বক সমস্ত সমস্ত সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার পদ্ধতি গ্রহণ করেনি,যার ফলে ব্যক্তিগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এবং সত্য এটাই যে, এই ধরণের পার্থক্য মুছে ফেলা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ শারীরিক শক্তির ব্যবধানকে মুছে কে ফেলতে পারে? মানসিক শক্তির পার্থক্যকে কে মুছে দিতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে নিজের ভাইদের জন্য বলিদান ও আত্মত্যাগের চেতনা জাগ্রত করা যেতে পারে। এর জন্য ইসলাম জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করেছে। সেগুলি অনুসরণ করলে ব্যক্তি সামর্থ নষ্ট না করে সমাজে সামগ্রিক সমৃদ্ধির সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপস্থাপিত ইসলামী সাম্যের বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এখন আমি মহানবী (সা.)-এর জীবনীর আলোকে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি।

মানব সমাজে যারা সাম্য ও সমতার কথা বলে নিঃশ্বাস ফেলেন, তারাও জানেন যে আজকের সমাজেও গরিব ও অসহায়দের এতটাই দুর্বল ও মর্যাদাহীন মনে করা হয় যে তাদেরকে পাশে বসাতে বা তাদের পাশে বসতে কেউ পরোয়া করে না। এমনকি তাদের সঙ্গে চলাফেরা লজ্জা বলে মনে করে। কিন্তু আমাদের নেতা পরোপকারী মানবতার গৌরব ছিল অনন্য। তিনি (সা.) প্রায়ই এই দোয়া করতেন-

"হে আল্লাহ্, আমাকে গরীব বানিয়ে বাঁচিয়ে রেখো এবং একই অবস্থায় গরীবদের জামাতে উঠিয়ে নিও।"

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক গ্রামবাসী যার নাম জাহির ছিল সে দেখতে খুবই সাদামাট ও কুৎসিত ছিল। একদা সে বাজারে তার মাল বিক্রি করছিল আর সে ঘামে ভিজে ছিল। নবী করীম (সা.) পেছন থেকে গিয়ে তার চোখের উপর হাত রাখলেন, হাতের ছোঁয়ায় তিনি অনুমান করলেন ইনি হলেন আমার প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) । তখন সে আনন্দে ও ভালবাসায় মহানবী (সা.)-এর বরকতময় শরীরে তার পিঠ ঘষতে লাগলো। নবী করীম (সা.) বললেন, আমার এই গোলামকে কে ক্রয় করবে? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রসুল,

তাহলে আপনি আমার জন্য খুবই মূল্যহীন দাম পাবেন, আমাকে কে কিনবে? তিনি (সা.) বললেন, না, না, আল্লাহর দৃষ্টিতে তুমি মূল্যহীন নও। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তোমার মূল্য অনেক বেশি।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১)

মহানবী (সা.) গরীব দুঃখীদের দাওয়াতের জন্য জোর দিতেন এবং বলতেন যে, ঐ দাওয়াত খুবই মন্দ যে দাওয়াতে কেবলই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দাওয়াত দেওয়া হয় আর গরীবদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

(বুখারী, কিতাবুল নিকাহ) হযরত খাদিজা (রা.) এর সহিত যখন তাঁর (সা.) বিবাহ হয়, তখন সেই ধনী মহিলা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং দাসদাসী তাঁর (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন। তিনি (সা.) ঐ সকল দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন আর তাদের মধ্য থেকে একজন মেধাবী ক্রীতাদাসকে মুক্ত করেন এবং তাকে তিনি পালক পুত্র করেন এবং তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ নামে ডাকা হয়। কিন্তু যখন মহান আল্লাহ্‌ এই রীতি বাতিল করেন এবং ঘোষণা দেন যে, পালক সন্তানদের তাদের পিতার কাছে ফেরত পাঠাও। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৫-৬) তাই তাকে আবার যায়েদ বিন হারিসা বলা হয়। কিন্তু তিনি (রা.) তার বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরিবর্তে মহানবী (সা.) এর বাড়িতে থাকতে পছন্দ করেন। আর মহানবী (সা.) এই মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের প্রতি আজীবন অপরিসীম ভালবাসা ও মমতাপূর্ণ আচরণ করেছেন।

কেবল এই নয়, মহানবী (সা.) তাঁর সামর্থ্যের কথা মাথায় রেখে তাঁকে বহু সামরিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করতে থাকেন এবং হযরত জায়েদ (রা.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর যুবক পুত্র উসামাকে এতটাই সম্মান করতেন যে জীবনের শেষ দিনগুলিতে তিনি তাঁর (সা.)-এর তৈরী করা সেনাবাহিনীর কমান্ড অর্পন করেছিলেন। যার মধ্যে মহান সাহাবিরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সুতরাং মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার ব্যবহারিক অভিব্যক্তি এবং দক্ষতার ভিত্তিতে পরিষেবা প্রদান করা। এক্ষেত্রে হতে পারে যে তারা প্রতিটি জাতি ও সমাজের দুর্বল ও পশ্চাদপদদের প্রতি কেমন আচরণ করে। এই অর্থে মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত উন্নয়নশীল জাতির জন্য পথের দিশারী।

শ্রদ্ধেয় শ্রোতাবৃন্দ! মানবতা কেবল মাংস ও পোস্ত দিয়ে তৈরী মূর্তিকে উঁচু স্থানে স্থাপন করে সম্মান বা পুজা করার নাম নয়, মানবতা হল তার হৃদয় ও মনের চিন্তা, আবেগ অনুভূতি, তার আত্মা এবং তার নৈতিক ও আধ্যত্মিক অবস্থার নাম। যদি এই মূল্যবোধগুলি অনুসরণ করা হয়,তবে বলা যেতে পারে যে, হ্যাঁ তিনি মানবতাকে সম্মান করেছেন। এই অর্থে আমরা যখন আমাদের মনীব ও সর্দার হযরত আকদস মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনী দেখি, তখন এমন অদ্ভুত ও বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখতে পাই যা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না।

একজন ব্যক্তি তার বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন এবং একই বিশ্বাস ও ধর্মের লোকদের সঙ্গে সহনশীল আচরণ করলেও অপরিচিত, প্রতিপক্ষ ও শত্রুদের সহিত সে কেমন আচরণ করে তা দেখতে হবে।

একবার মদিনায় এক ইহুদীর জানাযা আসছিল। রসুল করীম (সা.) জানাযার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে রসুলুল্লাহ্‌! এটি একটি ইহুদীর জানাযা। তিনি (সা.) বললেন, "তাঁর মধ্যে কি প্রাণ ছিল না?সে কি মানুষ ছিল না?"

(বুখারী, কিতাবুল জানায়েয)

হযরত ইয়ালা (রা.) বিন মররাহ বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা.) এর সাথে অনেক সফর করেছি। একবারও এমন হয় নি যে, তিনি (সা.) মানুষের লাশ দেখে কবর দেন নি। তিনি (সা.) কখনও জিজ্ঞাসা করেন নি সে মুসলমান না কি কাফের। সুতরাং বদরের যুদ্ধে ২৪ জন মুশরিককে শত্রু সর্দারকে বদরের ময়দানে একটি গর্তে দাফন করিয়েছিলেন, যাকে কালিবে বদর বলা হয়। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযি)

উহুদের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকরা রসুলুল্লাহ (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.) এর নাক-কান কেটে ফেলেছিল আর এটাই ছিল তাদের রীতি। আহযাবের যুদ্ধে তাদের একজন সর্দার নওফল বিন আব্দুল্লাহ্‌ মখজুমি নিহত হলে তারা (মুশরিকরা) ভেবেছিল যে মুসলমানেরা এখন আমাদের সর্দারের লাশের সহিত ঐ রকম আচরণ করবে (অর্থাৎ কান-নাক কেটে ফেলবে) । তাই তারা রসুলুল্লাহ্‌ (সা.) এর নিকট বার্তা প্রেরণ করল যে, আমাদের কাছ থেকে দশ হাজার দিরহম নিয়ে নওফিল এর লাশকে দিয়ে দাও। রসুল করীম (সা.) বললেন আমরা মৃতের মূল্য নিই না। তোমরা তোমাদের লাশ নিয়ে যাও।

(দালায়েলুল নবুয়ত লিল বাইহাকি, ৩য় খণ্ড)

আঁ হযরত (সা.) শত্রু পক্ষের মৃতদেহের অবমাননা করতে নিষেধ করেছেন।

যতদূর নারী ও পুরুষদের মধ্যে সাম্য সম্পর্কিত কথা, দুর্ভাগ্যবশত, আজকের উন্নত যুগে সাম্য ও স্বাধীনতার নামে নারী শোষনের ফলে সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। অন্যথায় ইসলাম কেবল নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেয় নি। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে তাদের অধিকার রক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে। বাস্তবতা হল ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে জন্মগত ও শারীরিক গঠনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অবহেলা করে নি আর করতেও পারে না। তাদের কথা মাথায় রেখেই ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব নির্ধারণ করেছে। ঘর সামলানো এবং সন্তান লালন পালন করা নারীর দায়িত্ব, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রম করে স্ত্রী ও সন্তানদের যাবতীয় বৈধ প্রয়োজন মেটানো পুরুষের দায়িত্ব।

নারী স্বাধীনতা ও সমতার তথাকথিত অগ্রদূতদের বাস্তব ভূমিকা দেখুন, তারাও নারীদের দিয়ে চাকরী করায় এবং রান্নাঘরের দায়িত্ব পালন ও শিশুদের লালন পালন ও যত্ন নেওয়ার দায়িত্বও নারীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এটা স্বাধীনতা ও সাম্যের নামে নারীর উপর অত্যাচার। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না।

ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সুন্দর আচরণের শিক্ষা দিয়েছে এবং সামজে তাদের যে সম্মান দেওয়া হয়েছে তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দেখা যায় হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পারিবারিক জীবনে।

তাই মাদনী যুগে যখন তাঁর বয়স ৫০ বছর অতিক্রম করেছিল, কেবলমাত্র তরবীয়ত ও জাতীয় প্রয়োজনীয়াতার তাগিদে নবী করীম (সা.) কে বেশ কয়েকটি বিয়ে করতে হয়েছিল এবং একই সময়ে তাঁর তত্ত্বধানে ও তরবীয়তে ৯ জন স্ত্রী ছিল। কিন্তু খুব ভাল ব্যবস্থাপনা ও সম্পূর্ণ সংযত এবং ন্যায়বিচারের সহিত তিনি সকলের অধিকার প্রদান করতেন এবং সকলের যত্ন নিতেন। যদিও তাঁদের পক্ষে বিলাস বহুল আসবাবপত্র দুরে থাক, দুবেলা খাবারের জন্য রুটি জোগাড় করা কঠিন ছিল। তবুও প্রত্যেক স্ত্রী তাঁর সাহচর্যে গর্বিত ছিল। এবং যখন বিজয়ের এবং প্রচুর সম্পদের প্রাচুর্যের সময় আল্লাহর নির্দেশে নবী করীম (সা.) তাঁর স্ত্রীদের কে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, যদি তোমরা পার্থিব জীবন ও তার সাজসজ্জা কামনা করা তাহলে এসো আমি তোমাদেরকে পার্থিব ধনসম্পদ দান করে নিজের থেকে তোমাদেরকে আলাদা করে দিই। তখন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক স্ত্রীই সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর রসুলের সঙ্গে থাকতে পছন্দ করেন।

পরিবার-পরিজনদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মহান দয়ার কথা উল্লেখ করে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি (সা.) নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ছাগলের দুধ তিনি নিজেই দুইতেন। জুতো ও বাড়ির জিনিসপত্র নিজেই মেরামত করে নিতেন। গভীর রাতে বাড়ি ফিরলে কাউকে বিরক্ত না করে বা ঘুম থেকে না জাগিয়ে তিনি নিজেই খাবার বা দুধ বের করে খেয়ে নিতেন।

তাই মানবতার সৎ ও নেককার স্ত্রীদের আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা পার্থিব আরাম-আয়েশের বিবেচনায় ছিল না। তাঁরা (রা.) তাঁর (সা.) মুখের কথার জন্য ক্ষুধার্ত ছিল, তাঁর সদয় আচরণ নিয়ে গর্বিত ছিল। তাঁর সদ্ব্যবহার সহানুভূতি ও রহমতে কাছে ঋণী ছিল।

প্রিয় শ্রোতাবৃন্দ! সেই যুগের প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর পবিত্র স্ত্রীদের প্রতি যে উত্তম আচরণ, উদারতা এবং প্রশংসা সুলভ ব্যবহার দেখিয়েছিলেন তা দেখুন। যখন আরবদের নিকট নারীদের কোন মূল্য ছিল না, বরং পুরুষরা তাদেরকে জুতোর মত ব্যবহার করত এবং একজনকে অপছন্দ হলে পরিবর্তন করে নিত,এমনকি কন্যা সন্তানের জন্মকে অশুভ মনে করা হত। কিছু নিষ্ঠুর পিতা তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। নারীদেরকে নিকৃষ্ট ও মুর্খ মনে করা হত,তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনা বা তাদের সাথে পরামর্শ করাকে পুরুষের জন্য অপমান বলে মনে করা হত। কিন্তু মহানবী (সা.)এই শ্রেণীর নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন,এই উন্নত যুগেও যখন সর্বত্র নারী স্বাধীনতা ও সাম্যের স্লোগান উঠছে, তখনও এর উদাহরণ পাওয়া কঠিন।

সুতরাং মানবতাবাদী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) জীবনের শেষ হজ্বে যে খুতবা দিয়েছিলেন তা মানবতার মাথা উঁচু করে এবং সুউচ্চ পতাকা যা কিয়ামত পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উড়তে থাকবে এবং মানবজাতিকে মানবতার শিক্ষা দিতে থাকবে।

রসুল করীম (সা.) এর প্রেমিক আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদীয়ে মাউদ (আ.) বলেন-

"যদি আল্লাহকে পেতে চাও, তাহলে গরীবের অন্তরে সন্ধান কর। সেই জন্য নবীগণ গরীবদের পোশাক পরিধান করেছিলেন। একইভাবে বড় জাতির মানুষের উচিত নয় ছোট জাতির উপহাস করা। এবং কেউ যেন না বলে যে তার বংশ উচ্চ। আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন,যখন তুমি আমার কাছে আস,আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করব না তোমার জাতি কি? বরং প্রশ্ন হবে তোমার কর্ম কি? একইভাবে আল্লাহর নবী (সা.) তাঁর

(এরপর শেষের পাতায়...)

হযরত আবু উসমান (রা.) এবং হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান (রা.) এর পবিত্র জীবনী।

মূল- জয়নুদ্দীন হামিদ, দারুল কাযা কাদিয়ান

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۔

মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র রসুল, এবং যাহারা তাহার সঙ্গে আছে, তাহারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর কিন্তু পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত। তুমি তাহাদিগকে রুকু ও সেজদারত দেখিতে পাইবে, তাহারা সর্বদা আল্লাহ্‌র ফযল ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য যত্নবান থাকে।

(সূরা ফাতাহ, আয়াত: ৩০)

আজকের এই মহতি সভায় আমি রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান (রা.) সম্পর্কে বর্ণনা করব। ইনশাআল্লাহ।

সম্মানীয় শ্রোতাবৃন্দ! আঁ হযরত (সা.) পবিত্রকরণ শক্তি ও অসাধারণ তরবীয়তের পরিণামে সাহাবাদের মধ্যে যে মহান আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছিল তার চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

احيت اموات القرون بجلوة
ماذا يماثلك بهذا الشان

অর্থাৎ শত শত বছরের মৃতদেরকে তুমি একই ,,,,,, জীবিত করে তুলেছ। কে আছে যে এই মর্যাদায় তোমার সমতুল্য হতে পারে?

হযরত আকদস রসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবাদের এমনভাবে তরবীয়ত করেছিলেন যে হুযুর (সা.) তাদেরকে আধ্যাত্মিকতার আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم

অর্থাৎ আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র সদৃশ। তাদের মধ্য থেকে যাকেই তুমি অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।

সাহাবাগণের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

أن الصحابة كلهم كنجباء
قد نوروا وجه الورىٰ بضياء

অর্থাৎ সাহাবাদের সকলেই সূর্যের ন্যায়, তাঁরা নিজেদের জ্যোতিতে সৃষ্টিজগতের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

সুধী শ্রোতামন্ডলী! এই উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের মধ্য একটি মহানক্ষত্র হনে সৈয়্যদানা হযরত উসমান (রা.)-এর সত্তা , যিনি খিলাফতে রাশেদার তৃতীয় বিকাশ-স্থল হিসেবে ইসলামের নাম সমুন্নত করতে বহু আযিমুশশান কার্য সম্পাদন করেছেন এবং অবশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন।

হযরত উসমান (রা.) কুরাইশদের বনু উমাইয়া গোত্রে আসহাবে ফীল এর ঘটনার পাঁচ বছর পর ৫৭৫ খৃষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বেশ ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। শৈশব থেকেই তাঁর প্রকৃতিতে পুণ্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। আঁ হযরত (সা.) যখন খোদার আদেশে নবুয়তের দাবী করেন, তখন তাঁর বয়স ৩৪ কিম্বা ৩৫ বছর। তিনি আঁ হযরত (সা.) কে তাঁর উচ্চ নৈতিকতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অনেক সমীহ করতেন। আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) আঁ হযরত (সা.) এর উপর আনয়নের দিক থেকে সকলের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। সেই সময় হযরত উসমান (রা.) ব্যবসার কাজে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এলে হযরত আব বকর তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে হযরত উসমান বিন আফফানকেও ইসলাম গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান করেন। একে একে সকলে বয়আত করলেন। তাদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) সর্বপ্রথম বয়আত করেন।

নবুয়তের চতুর্থ বছরের শুরুতে আঁ হযরত (সা.) কে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ্যে তবলীগ করার আদেশ দেন আর অচিরেই মক্কার অলিতে গলিতে ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয়ে যায়, ফলে মক্কার কুরায়েশরা বিরোধিতা শুরু করে দেয় আর যারা মুসলমান হয়েছিল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য অত্যাচার শুরু করে দেয়। তাঁর চাচা হাকাম বিন আবুল আস তাঁকে অনেক মারধর করে এবং আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে যেতে বাধা দিতে তাঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেয়। তিনি ধৈর্য ধারণ করেন এবং এই সব বিপদাবলীর কোন পরোয়া করেন নি। কিছু দিন পর তাঁর ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন।

হযরত উসমান অত্যন্ত পুণ্যবান, সম্মানীয়, সুদর্শন ও সৎপ্রকৃতির যুবক চিলেন। তাঁকে তাঁর পরিবার থেকে আলারা করে দেওয়া হয়। এই কারণে আঁ হযরত (সা.) নিজের কন্যা রকিয়ার সঙ্গে হযরত উসমানের বিয়ে দেন।

মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের নিত্যনতুন ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের জন্য কষ্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আর হযরত উসমানের জন্য অনেক বিপদ ছিল। এমন পরিস্থিতিতে কিছু মুসলমান পুরুষ ও মহিলাকে ইথিওপিয়য় হিজরতের অনুমতি দেওয়া হয়। হযরত উসমান ও তাঁর স্ত্রী হযরত রকিয়াও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইথিওপিয়া গমনকারী দলের তিনিই ছিলেন নেতা। ইথিওপিয়ায় কিছু দিন অবস্থান করার সময় তিনি সেখানে তবলীগ করারও সুযোগ পান। এইভাবে তিনি সেই সব মুষ্টিমেয় লোকদের

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ইসলামের সূচনাতেই ভিন দেশে তবলীগ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

আঁ হযরত (সা.) এক এক করে মক্কার মুসলমানদের যখন মদিনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন, তখন হযরত উসমানও নিজের স্ত্রী হযরত রকিয়াকে সঙ্গে নিয়ে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার পর হযরত উসমানের স্ত্রী হযরত রুকাইয়া ইন্তেকাল করেন। হযরত রুকাইয়ার মৃত্যুর পর আঁ হযরত (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমের সঙ্গে হযরত উসমানের নিকাহ করেন। এইরূপে আঁ হযরত (সা.)-এর দুই কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হওয়ার কারণে তিনি 'জুন নুরাইন' (দুই জ্যোতি বিশিষ্ট) নামে খ্যাতি লাভ করেন।

সুধী শ্রোতামণ্ডলী! আরবে প্রাচীন কাল থেকেই ক্রীতদাসত্ব প্রথা প্রচলিত ছিল। ইসলাম এই প্রথা নিষিদ্ধ করে এবং ক্রীতদাসদের মুক্ত করাকে এক বিরাট পুণ্যকর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করে। রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত উসমান হাজার হাজার ক্রীতদাসদের মুক্ত করেছিলেন এবং মদিনার কোন গলি এমন ছিল না যেখানে তাঁর ক্রয় করা ক্রীতদাস চোখে পড়ত না। পরবর্তীতে এই পুণ্যকর্মটি অব্যাহত রাখতে তিনি প্রতি জুমআর দিন একজন করে ক্রীতদাস মুক্ত করার রীতি বানিয়েছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) কিছু অসাধারণ সেবা করার তৌফিক পেয়েছিলেন। মদিনায় হিজরত করার পর মুসলমানদের ভীষণ অভাব অনটনের সম্মুখীন হতে হয়েীছল যা দীর্ঘসময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। প্রাথমিক চাহিদাবলীর অন্যতম হল পানীয় জলের চাহিদা। আঁ হযরত (সা.) একদিন মুসলমানদেরকে আহ্বান করেন যে, মিষ্টি জলের কুয়োটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য উৎসর্গ করা হোক, যেটি কি না এক ইহুদীর মালিকানাধীন ছিল। হযরত উসমান সেই কুয়োটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন উৎসর্গ করে দেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত উসমান এবং অন্যান্য সাহাবাদের মদিনায় হিজরত করে আসা তখন ছয় বছর অতিক্রান্ত হয়েচিল। মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে হজ্জ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।এমতাবস্থায় হযরত উসমান এক বরকতময় স্বপ্নে দেখেন, আঁ হযরত (সা.) চৌদ্দশ-পনেরোশ সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে খানা কাবা তওয়াফ করছেন। এই স্বপ্নটি অনুসারে চৌদ্দশ পনোরোশ সাহাবা সঙ্গে নিয়ে আঁ হযরত (সা.) খানা কাবা তওয়াফের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়া স্থানে গিয়ে আঁ হযযরত (সা.) কুরাইশদের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এই চুক্তিটি ইসলাতের ইতিহাসে হুদাইবিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সেই সময় আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমানকে ইসলামের দূত হিসেবে মক্কার কুরাইশদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। ইসলামের দূত হিসেবে হযরত উসমানের হুদাইবিয়ায় সেবাদান তাঁর জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই সন্ধি তার সুদূরপ্রসারী পরিণামের প্রেক্ষিতে অনেক বড় সেবা ছিল।

হুদাইবিয়া সন্ধির দুই বছর পর আল্লাহ্ তা'লার তকদীর সমহিমায় প্রকাশিত হয়। ৮ম হিজরীতে আঁ হযরত (সা.) দশ হাজার সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন। হযরত উসমান (রা.)ও এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের ক্রমবিস্তারের পাশাপাশি মুসলমানদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল আর মসজিদ নববীর স্থান অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তাই আঁ হযরত (সা.) মসজিদ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেন আর সাহাবাদের আহ্বান জানান যে মসজিদ সংলগ্ন বাড়িগুলি ক্রয় করে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। হযরত উসমান (রা.)এর আর্থিক প্রাচুর্য ছিল, সেই সাথে তাঁর মাঝে আর্থিক কুরবানীর প্রেরণাও ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ ২৫-৩০ হাজার দিরহামের ব্যবস্থা করেন আর মসজিদ নববীর আশপাশের বাড়ি ও জমি ক্রয় করে মসজিদ নববীর অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর এই কুরবানী এবং ধর্মীয় সেবা কিয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যত প্রজন্ম স্মরণ রাখবে।

আঁ হযরত (সা.) তবুকের যুদ্ধের জন্য যখন আর্থিক কুরবানীর আহ্বান

করেন, হযরত উসমান সেই সময় এক হাজার উট আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, যাদের মধ্যে একশটিতে খাদ্যশস্য বোঝাই করা ছিল। ছোড়াও ছিল একশটি ঘোড়া এবং দশ হাজার দিনার নগদ। তিনি সেনার ব্যয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ একাই বহন করেছিলেন। আঁ হযরত (সা.) হযরত উসমান (রা.) এর এমন অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। হযরত উসমান (রা.) নিজেও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) ইসলামের যে সকল সেবার যে তৌফিক লাভ করেছেন, সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল কুরআন করীমের অক্ষর বিন্যাস দেওয়ার কাজ। তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে ওহী লেখার কাজ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.) ওহীর লেখনী ও আঁ হযরত এর নির্দেশানুসারে আয়াত ও সূরাগুলকে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করার কাজের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছিল। এই কাজ সমস্ত কুরআন করীমের অবতরণ থেকে বিন্যাসের কাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের যুগে দক্ষিণ হস্ত হয়ে কাজ করার তৌফিক পেয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের বিভিন্ন বিষয়াদিতে তিনি পরামর্শদাতা হিসেবে সেবা করেছেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন আর তিনি যখন ইসলামী শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তার জন্য বিভিন্ন বিভাগ গঠন করেন,তখন হযরত উসমান (রা.) কে সদকার হিসেবরক্ষ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। হযরত উসমানকে খিলাফতের 'আমীন' বলা হত।

হযরত উমর ফারুক (রা.) এর উপর ২৩ হিজরীর ২৩ যিল হজ্জ তারিখে প্রাণঘাতী আক্রমণ হয়। হযরত উমর (রা.) খিলাফত নির্বাচনের জন্য একটি কমিটি গঠন করে রেখেছিলেন। সেই তালিকায় হযরত উসমান (রা.) নামও উপরের সারিতে ছিল।

আক্রমণের চার দিন পর হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যু হয় ২৭ যিল হজ্জ, ২৭ হিজরীতে। এর তিন দিন পর হযরত উসমান (রা.) নিরঙ্কুশ রায়ে তৃতীয় খলীফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

হযরত উমর (রা.) যে শাসন ব্যবস্থা রেখে গিয়েছিলেন, তিনি সেই ব্যবস্থাকেই এগিয়ে নিয়ে যান, এর মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্তন করেন নি।

তবে পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন অনুসারে তিনি কয়েকজন গভর্ণরকে পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি সমগ্র ইসলামী বিশ্বে জুমআর নামায আদায়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন এবং তিনিই জুমাআর নামাযের পূর্বে দ্বিতীয় আযানের প্রবর্তন করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের যুগে একাধিক স্থাপত্য নির্মাণের কাজ হয়। বিভিন্ন ভবন সম্প্রসারণের পকিল্পনা গৃহীতহয় এবং জনকল্যাণমূলক কাজও হয়। একাধিক সার্বজনিক ভবন, সড়ক, সেতু, পান্থশালা এবং সরাইখানা নির্মিত হয়। তাঁর যুগে যে সমস্ত এলাকা বিজীত হয়েছিল, সেই সব এলাকায় সেনা ছাউনি নির্মিত হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় চারণভূমিও সম্প্রসাারিত হয় আর সাধারণ মানুষ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে শুরু করে।

হযরত উসমান (রা.) খিলাফত কালে একদিকে যেমন একের পর এক দেশি জয় হয়েছে এবং দলে দলে মানুষ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তেমনি ইসলামী সাম্রাজ্যে খিলাফত এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা- এই উভয়কে ধ্বংস করার জঘন্য ষড়যন্ত্রও রচিত হয়েছে। ইয়েমেনের অধিবাসী আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা নামী এক অপবিত্র হৃদয়ের ইহুদীর নেতৃত্বে ভয়াবহ নৈরাজ্য মাথাচাঁড়া দেয় যার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে দেখা দেয় হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদতের ঘটনা।

শাহাদতের সময় হযরত উসামন (রা.)এর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী, সত্যবাদী এবং খোদার প্রতি আস্থাশীল মানুষ ছিলেন। তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিত হয়েছে ইসলামের সেবা ও ইবাদতে নিমজ্জিত থেকে। সেই সকল বিশিষ্ট সাহাবাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের প্রতি আঁ হযরত (সা.) এর বিশেষ ভালবাসা ছিল। আঁ হযরত (সা.) তাঁর জীবনে একাধিক বার তাঁর প্রতি নিজের সন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছেন। আঁ হযরত (সা.) এর একের পর এক দুই কন্যার সঙ্গে তাঁর নিকাহ হয়, যে কারণে তিনি 'জুন নুরাঈন' (দুই জ্যোতি বিশিষ্ট) উপাধি লাভ করেন।

যেভাবে তিনি ইসলামের নাম সমুন্নত রাখতে এবং কুরআনের প্রচার ও খিলাফতের প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের ধন-সম্পদ, প্রাণ, সময় ও সম্মান বিসর্জন দিয়েছেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহর কাজে নিয়োজিত থেকেছেন এবং নৈরাজ্যের সময় শক্তি ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও শান্তির দূত হয়ে ধৈর্য ও অবিচলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, আগামী প্রজন্ম কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর এই পবিত্র নমুনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকবে। ইনশাআল্লাহ্।

হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খান সাহেব এর স্মৃতিচারণ

বক্তব্যের দ্বিতীয় ভাগে সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেবের পবিত্র জীবনী সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণকারীদের জীবনী সম্পর্কে যখন আমরা অধ্যায়ন করি, তখন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, রসুল করীম (সা.)-এর সাহাবাগণের সমস্ত স্বভাব ও প্রশংসনীয় গুণাবলী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাগণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর সম্মানীয় সাহাবী হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেবের পবিত্র জীবনীর বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি।

সুধী শ্রোতাবর্গ! হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেব (রা.) এক সম্ভ্রান্ত গৌরি বংশের সদস্য। তিনি মালের কোটলা রাজ্যের জমিদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ শেখ সদর জাহাঁ সাহেব একজন খোদাভীরু বুজুর্গ এবং জালালাবাদের পাঠান ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল নওয়াব গোলাম মহম্মদ খান সাহেব। ১লা জানুয়ারী ১৮৭০ সালে নওয়াব বেগম সাহেবার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর মায়ের তৃতীয় সন্তান ছিলেন। শৈশব থেকেই ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। সরাসরি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সংস্পর্শে আসার পূর্বে হযরত নওয়াব সাহেবের পরিবারের এক সম্মানীয় সদস্যের হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী হয়েছিল, যার কারণে একদিন হুযুর (আ.) এর মালের কোটলা আগমণ হয়। ১৮৮৪ সালে হযুযর (আ.) এই সফর করেন। এর কারণ এই ছিল যে, নওয়াব ইব্রাহিম আলী খান সাহেব বরাহীনে আহমদীয়ার প্রকাশনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁকে দেখতে এবং এবং তাঁর জন্য দোয়া করতে সেখানে যান, যাতে তাঁর শ্রুশ্রূষা ও কৃতজ্ঞতার বাস্তবিক চেতনা প্রকাশ পায়।

হযরত নওয়াব সাহেব শৈশব থেকেই ধমীয় পরিবেশে লালিত পালিত হয়েছেন। শৈশবে তিনি তাঁর উসতাদের কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর উল্লেখ শুনেছিলেন। তাঁর উপর ধর্মের অনেক প্রভাব ছিল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই সময় কোন দাবি করেন নি। ধীরে ধীরে তাঁর কাছে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কথা পৌঁছতে থাকে। হযরত নওয়াব সাহেব হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কে ১৮৯৯ সালে চিঠি লেখা শুরু করেন। হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেব ১৮৯০ সালে ২০ বছর বয়সে কাদিয়ানের ঐতিহাসিক সফর করেন। তাঁর প্রকৃতিতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এক বিশেষ গুণ দেওয়া হয়েছিল, যার কারণে তিনি সত্য অন্বেষণে কাদিয়ান সফর করেন। কেননা তখনও তিনি আহমদীয়াতের বাহুপাশে আবদ্ধ হন নি। পরবর্তীকালে কিছু প্রশ্নের সন্তুষ্টিজনক উত্তর পাওয়ার পর তিনি কোন গড়িমসি না করেই বয়আত করার জন্য পত্র লেখেন। বয়তাতের রেজিস্টারে তাঁর বয়আত নম্বর ২১০ নম্বর, তারিখ ১৯ শে নভেম্বর, ১৮৯০ সাল লিপিবদ্ধ আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর রচনা ইযালায়ে আওহাম গ্রন্থ হযরত নওয়াব সাহেব এবং পরিবারে কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) হযরত নওয়াব সাহেবকে নিজের লেখা এক চিঠিতে বার বার আহ্বান জানিয়ে লেখেন, কিছু সময় তিনি যেন তাঁর কাছে এসে অবস্থান করেন। তিনি লেখেন-আমি চাই, যেভাবেই হোক, ২৭ শে ডিসেম্বর, ১৮৯২ সাল এর জলসায় আপনি অবশ্যই আসবেন।"

হযরত নওয়াব সাহেব এই জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এর মনোযোগ, স্নেহ ও দোয়ার কারণে আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে নওয়াব সাহেবের যাবতীয় সমস্যাবলীর নিরসন করে দেন এবং তিনি উদার মনে কাদিয়ানে হিজরত করে আসার তৌফিক লাভ করেন। হিজরতের পর তিনি এসে দু'টি মাটির ঘরে অবস্থান করেন, যেটি 'আদ্দার' সংলগ্ন ছিল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত নওয়াব সাহেবকে কাদিয়ানে বেশ কয়েকবার নিজের বাড়ি তৈরী করার আহ্বান করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁর গৃহে অনেক বরকত দান করেন। হযরত নওয়াব সাহেবের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে দুই সন্তান জন্ম লাভ করে। একজন হল আমাতুস সালাম, যে জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়। দ্বিতীয় কন্যা হলেন হযরত বু জয়নব বেগম সাহেবা, যিনি পরবর্তীতে হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের স্ত্রী হন। তাঁর জন্ম হয় ১৮৯৩ সালের ১৯ই মে তারিখে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আরও চার পুত্র সন্তান দান করেন।

আল্লাহ্ তা'লার তকদীরের অধীনে ১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জেষ্ঠ্যা কন্যা সাহেবযাদী হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবার সঙ্গে হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেবের নিকাহ হয়। এই নিকাহ হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেব পড়িয়েছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মৃত্যুর পর ১৯০৯ সালের

১৪ই মার্চ হযরত নবাব মুবারকা বেগম সাহেবা রুখসাতানার পর হযরত নওয়াব সাহেবের গৃহে আসেন। ১৯০৯ সালের ৯ই মে তারিখে হযরত নওয়াব সাহেবের প্রথমা স্ত্রী থেকে একমাত্র কন্যা হযরত নওয়াব বু জয়নব বেগম সাহেবার নিকাহ হয় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর পুত্র মির্যা শরীফ আহমদ সাহেবের সঙ্গে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবদ্দশাতেই এই সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। হযরত বু জয়নব সাহেবা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)এর দাদী। যদিও নওয়াব সাহেব এবং হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবার বয়সেরর মাঝে ২৭ বছরের পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও হযরত নওয়াব সাহেব হযরত নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবার বুদ্ধিমত্তা, বোধশক্তি, ভালবাসা, বিশ্বস্ততা এবং চরিত্রের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে এক পবিত্র পিতার পবিত্র সন্তান হিসেবে অনেক সমীহ করতেন। হযরত নওয়াব সাহেব তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয়েও হযরত বেগম সাহেব বরকত অন্বেষণ করতেন।

একবার তিনি হযরত বেগম সাহেবাকে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার দিয়ে বললেন, এতে কিছু পঙক্তি লিখে দিন। হযরত বেগম সাহেবা ক্যালেন্ডারের মাথায় লিখলেন-

'ফজল খোদা কা সায়া হাম পে রাহে হামেশা, হার দিন চাড়হে মুবারক, হার শব বাখাইর গুজরে।'

অর্থাৎ আমাদের উপর চিরন্তর খোদা তা'লার কৃপার ছায়া বজায় থাকুক/ প্রতিটি দিন কল্যাণ বয়ে আনুক আর রাত্রি কাটুক নির্বিঘ্নে। '

তিনি বলেন, এই পঙক্তিটি নবাব সাহেব প্রতি বছরের ক্যালেন্ডারের মাথায় লিখে দিতেন। অনুরূপভাবে হযরত নওয়াব সাহেব প্রায় তাঁর কাছে পঙক্তি লেখার অনুরোধ করতেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত নওয়াব সাহেবকে বেশ কয়েকবার কাদিয়ানে আসার এবং কাদিয়ানে ঘর তৈরীর আহ্বান জানিয়েছিলেন। যেমন হযরত নওয়াব সাহেব হিজরতের পূর্বে দারুল মসীহ সংলগ্ন পূর্ব দিকের জমিতে একটি বা দুটি মাটির ঘর তৈরী করেছিলেন। কয়েক বছর পর সেগুলি ভেঙ্গে একটি পাকা ঘর তৈরী করেন। এটি আদ্দার' এরই অংশ। প্রথম খিলাফতের সময় তিনি কাদিয়ানের বাইরে, যেখানে অপেক্ষাকৃত কম জনঘনত্ব ছিল, একটি উন্মুক্ত স্থানে দারুস সালাম কোঠি তৈরী করান এবং সেই সঙ্গে বাগানও তৈরী করেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) হযরত নওয়াব সাহেবকে এই মর্মে চিঠি লেখেন যে, কাদিয়ান আসার সময় নিজের ফোনোগ্রাফ সঙ্গে করে নিয়ে এসো, যাতে বিদেশে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বার্তা রেকর্ড করে পাঠানো যায়। হযরত নওয়াব সাহেব ফোনোগ্রাফ নিয়ে কাদিয়ান আসেন এবং তাতে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর নযম ' আওয়াজ আ রাহি হ্যা ফোনোগ্রাফ সে' এবং আরও কিছু নযম ও বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। হযরত নওয়াব সাহেবের ফোনোগ্রাফে প্রথম বিদেশে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজে বার্তা রেকর্ড করা হয়।

হযরত নওয়াব সাহেব মানুষের যোগ্যতা বিচারের কাজে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সূক্ষ্ম বোধশক্তি, বিশ্বস্ততা ও খোদা প্রদত্ত সুস্থ বিবেক তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছিল। এই কারণে প্রত্যেকটি বিষয়ের তদন্ত তিনি নিজেই করতেন। বিদ্বেষ ও ক্রোধ থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন, সব সময় সত্য গ্রহণে তৎপর থাকতেন। প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষার পর লাহোরে এচিসন কলেজে ভর্তি হন। এই কলেজটি পাঞ্জাবের জমিদারদের সন্তানদের জন্য সরকার তৈরী করে দিয়েছিল। মহিলাদের সংশোধনের জন্য তিনি 'আঞ্জুমান মুসলেহুল আখওয়ান' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ভিত রাখেন এবং একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যার ব্যয় ভার তিনি নিজে বহন করতেন। তিনি শিক্ষাকে সকলের জন্য সহজলভ্য করতে উৎসাহী ছিলেন। মাদ্রাসা আহমদীয়ার জন্য বেশ কয়েকবার আর্থিক সহায়তা দান করেছেন এবং তাঁরই উদ্যমে কাদিয়ানে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি সহজাতভাবে বদান্য ছিলেন। জামাতের গরীব-দুঃখীরা তাঁর বদান্যতায় স্বচ্ছল জীবন যাপন করত। তিনি কখনও দুঃখ ভারাক্রান্ত ও উৎকণ্ঠিত হতেন না। সব সময়ে মুখে হাসির ছোয়া থাকত। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। তিনি এতটই বিনয়ী ছিলেন যে, মসজিদ মুবারকের শেষের সারিতে জুতোর কাছে গিয়ে বসতেন। জামাতের কাজে সবসময় অগ্রণী থাকতেন।

হযরত নওয়াব সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর সঙ্গে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আনুগত্যের সম্পর্ক রাখতেন। এই কারণেই শেষ দুই সপ্তাহে হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর সেবা ও শুশ্রূষা সুযোগ পেয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা কাদিয়ানের বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। হযরত নওয়াব সাহেব নিজের কোঠি দারুস সালাম একটি অংশ হুযুরের জন্য ফাঁকা করে দেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল ১৯১৪ সালের ২৭ শে ফেব্রুয়ারী এখানে স্থানান্তরিত হন আর তিনি এই জায়গাটি অনেক পছন্দ করেন। দুই সপ্তাহ পর ১৩ই মার্চ হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল দারুস সালাম কোঠিতেই ইন্তেকাল করেন।

১৯০৩ সালের ১লা জানুয়ারী প্রাতঃভ্রমণের সময় হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ) হযরত নওয়াব সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন: "আজ রাত্রিতে আমি দিব্যদর্শনে আমার সামনে আপনার ছবি দেখেছি আর এটুকু ইলহাম হল- 'হুজ্জাতুল্লাহ্'। এ বিষয়ে এতটুকু বোঝা গেল যে, যেহেতু তিনি নিজের সমাজ ও জাতি থেকে পৃথক হয়ে এসেছেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা আপনার নাম 'হুজ্জাতুল্লাহ্' রেখেছেন। অর্থাৎ আপনি তাদের উপর 'হুজ্জত' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) হবেন। তিনি একাধিক বার বিভিন্ন আর্থিক কুরবানীতে অংশ গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন ভবন মেরামতের কাজেও যখন তখন আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন মাদ্রাসা আহমদীয়া, মিনারাতুল মসীহ এবং মরকযী লাইব্রেরি ইত্যাদি। তিনি কাদিয়ানে অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করেছেন। সড়ক সুগম করেছেন, পাকা নর্দমা তৈরী করেছেন এছাড়াও অসুস্থাদের সহায়তার জন্য অনেক বড় অর্থরাশি উপস্থাপন করেছেন। এছাড়াও জামাতের প্রথম পত্রিকা আল হাকামকে অনুদান দিয়েছেন, দারুল জিয়াফতের জন্য জমি ও আলফজল প্রবর্তনের জন্য সাহায্যও তাঁর আর্থিক কুরবানীর অন্যতম দৃষ্টান্ত।

আলফজল প্রবর্তনের জন্য হযরত নওয়াব মহম্মদ আলী খান সাহেব কিছু নগদ টাকা ও কিছু জমি দান করেছিলেন। এছাড়াও তিনি নিজের বাড়ির নিচের তলাও দিয়ে দেন। মাকবারার ব্যবস্থার জন্য হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন সাহেবের সভাপতিত্বে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে যখন সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হল, তখন হযরত নওয়াব সাহেবও এর সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯০০ -১৯১৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে থেকে জামাতের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার পূর্বে ৬ই জানুয়ারী থেকে ৫ ডিসেম্বর ১৯০২ পর্যন্ত প্রথমে তিনি রিভিউ অফ রিলিজিয়নস এর সহকারি অর্থ সচিব পদে এবং পরে অর্থ সচিব পদে সেবাদান করেছেন। ১৯০৯সালে তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার আমীন নিযুক্ত হন। ১৯১১ সালে তিনি সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার পক্ষ থেকে নাযির নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সালে এবং ১৯১৬ সালে দুই বছর পর্যন্ত হযরত নওয়াব সাহেব সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন।

হযরত নওয়াব সাহেব শিষ্টাচার ও সম্মানবোধের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। প্রায় নিজের সন্তান ও অন্যদেরকেও এর উপদেশ দিতেন।

তাঁর নিজের বড় ভাই, প্রবীণ সাহাবা এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের প্রতি তাঁর ভাবাবেগ অনেক গভীর ছিল। হযরত নওয়াব সাহেব ধৈর্য ও অবিচলতার উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে পরিস্থিতিতে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং বীরত্বসহকারে তা প্রকাশ করেছেন, সেটা তার চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি অনেক বেশি ক্ষমা প্রিয় এবং নৈরাজ্যের কারণে পর্দার পালনের বিষয়ে সমর্থক ছিলেন। নামায রোযা পালন, তাহাজ্জুদ, তিলাওয়াতে কুরআন এবং অন্যান্য ধর্মীয় কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। তিনি নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাঁর স্ত্রী হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেবা এ সম্পর্কে বলেন-

'রাত্রিতে তাহাজ্জুদের নামাযে যখন দোয়া করতেন, তখন মনে হত খোদা তা'লার নুরে ঘরের মধ্যে নাযেল হচ্ছে।"

হযরত নওয়াব সাহেব সকালে নামাযের পূর্বে কুরআন করীম তিলাওয়াত করতেন এবং বলতেন, কুরআন মজীদ একটি সমুদ্র, যে কেউ এই সমুদ্রে সন্তরণ করবে সে রিক্ত হস্ত ফিরবে না। হযরত নওয়াব সাহেব নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন না, কিন্তু যতদিন লিখেছেন, তাতেই তাঁর পবিত্র জীবনীর অনেক মূল্যবান তথ্য তাঁর লেখনী থেকে প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী, ৭৫ বছর বয়সে হযরত নওয়াব সাহেব ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাঁর জানাযা বহনে সঙ্গ দেন। বেহেশতি মাকবারা কাদিয়ানে সংলগ্ন বাগানে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা) তাঁর জানাযা পড়ান। তাঁর কবর সেই স্থানে হয় যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাজার মুবারক আছে। খোদা তা'লা তাঁর মর্যাদা উন্নীত করুন এবং স্বীয় নৈকট্য দান করুন।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524
সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516
POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-9 Thursday, 1-8 Aug, 2024 Issue No.31-32

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমরা আবদ্ধ হয়েছি যে, মক্কা থেকে যে ব্যক্তি আমাদের কাছে আসবে তাকে আমরা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিব। আবু জিন্দল কাতর আবেদন করে বলল, আপনি কি আমাকে অত্যাচারীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রসুল করীম (সা.)-এর হৃদয়েও বেদনা ছিল, কিন্তু তিনি বললেন, আবু জিন্দল! ধৈর্য ধারণ কর এবং শৃঙ্খলা মেনে চল। আমরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারি না। আল্লাহ্ তা'লা তোমার মুক্তির অন্য কোন উপায় বের করবেন।

একজন মুসলমানকে হত্যার শাস্তি

অনুরূপভাবে রসুল করীম (সা.)-যুগে একজন মুসলমান এক জিম্মীকে (মুসলমান শাসনের অধীনে থাকা অমুসলিম যারা জিজিয়া কর প্রদান করত) হত্যা করে। রসুল করীম (সা.)-এর সমীপে মুকদ্দমা পেশ হলে তিনি সেই মুসলমানকে হত্যার আদেশ দিয়ে বলেন- انا احق من اوفى بذمته অর্থাৎ এই জিম্মীর প্রতি বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি অধিকার আমার। (ইনায়া, শরাহ হিদায়াহ, ৮মখণ্ড,পৃ: ২৫৬)

অঙ্গীকারের প্রতি সম্মান

একবার রসুল করীম (সা.) একটি যুদ্ধে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি এক ব্যক্তির দেখা পান। সেই সময় লোকের ভীষণ প্রয়োজন ছিল। তিনি তার কাছে জানতে চাইলেন যে, সে এখানে কেন এসেছে। সে নিবেদন করল, আমি ইসলাম গ্রহণ করার জন্য মক্কা থেকে এসেছি। কিন্তু আমি সেখানে একথা বলে এসেছি যে, আমি মুসলমানদের সাহায্যের জন্য যাচ্ছি না। রসুল করীম (সা.) বললেন, যখন তুমি তাদেরকে এই কথা বলে এসেছ, তাই তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। কেননা এর ফলে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে।

হযরত আব্বাস এর বন্দি দশা

বদরের যুদ্ধে রসুল করীম (সা.)-চাচা হযরত আব্বাসও বন্দী হন। মুসলমানেরা তাদেরকে অন্যান্য বন্দীদের সাথেই দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে। সে যুগে যেহেতু এমন কোন উপায় ছিল না যার দ্বারা কয়েদীদের পালিয়ে যাওয়া রোধ করা যেত, এই কারণে কয়েদীদেরকে দড়ি দিয়ে মজবুত করে বাঁধা হত। হযরত আব্বাসকেও বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু তিনি যেহেতু অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন আর অনেক বেশি আদর যত্নে বড় হয়েছিলেন, এই কারণে তিনি কষ্ট সহ্য করতে না পেরে আর্তনাদ করতে থাকেন। তাঁর আর্তনাদ শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভীষণ কষ্ট পান আর সাহাবাগণ লক্ষ্য করলেন যে তিনি (সা.) কখনও এপাশ ফিরছেন কখনও ওপাশ ফিরছেন। তারা বুঝতে পেরে যান যে, তাঁর অস্থিরতার কারণ হযরত আব্বাস এর আর্তনাদ। তাই তারা হযরত আব্বাস এর দড়ি আলগা করে দেন। কিছুক্ষণ পর আঁ হযরত (সা.) যখন তাঁর আর্তনান শুনতে পেলেন না, তখন তিনি জানতে চাইলেন যে, আব্বাসের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল কেন? সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ্! আপনার কষ্ট দেখে আমরা তাঁর দড়ির বাঁধন আলগা করে দিয়েছি। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, সকল কয়েদীদের বাঁধন আলগা করে দাও। কিম্বা তাঁর বাঁধনও শক্ত করে দাও। অর্থাৎ তাঁর আত্মীয়র বাঁধন আলগা রেখে বাকিদের বাঁধন শক্ত করে বাঁধা থাকুক তা তিনি (সা.) পছন্দ করেন নি। তাই তিনি সকলের প্রতি সমান আচরণ করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর সঙ্গে এক ইহুদীর কথোকথন

একবার হযরত আবু বকর (রা.)এর সঙ্গে এক ইহুদীর কথপোকথন হয়। কথার মাঝে ইহুদী হযরত মুসা (আ.) কে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বসে। এতে হযরত আবু বকর ক্ষুব্ধ হন আর তিনি (রা.) সেই ব্যক্তির সঙ্গে রুক্ষ আচরণ করেন। কিন্তু রসুল করীম (সা.) বিষয়টি জানতে পেরে হযরত আবু বকর এর উপর রুষ্ট হন এবং তিনি বলেন, এভাবে সেই ইহুদীর সঙ্গে ঝগড়া করার আপনার অধিকার ছিল না।

মৃত্যু শয্যায় রসুল করীম (সা.)-এর নির্দেশ

ন্যায় প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) এতটাই সজাগ ছিলেন যে, মৃত্যু শয্যাতে তিনি সাহাবাদেরকেক বললেন, দেখ! আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমাদের সঙ্গে আমার সবসময় বিভিন্ন কাজে সম্পর্ক লেগেই থেকেছে। হতে পারে আমার দ্বারা তোমাদের কেউ কষ্ট পেয়েছে। আমি চাই না কিয়ামত দিবসে আমাকে খোদার সামনে জবাব দিতে হোক। অতএব, যে ব্যক্তি আমার হাতে কষ্ট পেয়েছে, সে আজ আমার কাছে প্রতিশোধ নাও। সাহাবাদের মনে এই কথা এমন গভীর প্রভাব ফেলল যে, তারা কাঁদতে শুরু করলেন। আঁ হযরত (সা.) এর হাতে কেউ কষ্ট পেয়েছে, এমনটা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। কিন্তু এরই মাঝে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে রসুলুল্লাহ্! আপনি এক যুদ্ধের সময় সারি সোজা করছিলেন আর আপনার সেই সময় এক সারি থেকে অপর সারিতে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সেই সময় আপনি যখন সারি ভেদ করে এগিয়ে গেলেন তখন আপনার কনুই আমার পিঠে আঘাত করেছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, বেশ, আমি বসে আছি, তুমি আমার পিঠে তোমার কনুই দিয়ে আঘাত কর। সাহাবাদের সেই মুহূর্তের অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। খাপ থেকে তাদের তরবারি বেরিয়ে পড়েছিল আর তারা সেই ব্যক্তিকে টুকড়ো টুকড়ো করে দিতে চাইছিল। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতাপের কারণে কিছু করতে পারত না। একথা শুনে সেই ব্যক্তি পুনরায় বলল, যে সময় আপনার কনুই আমাকে আঘাত করেছিল, তখন আমার শরীর অনাবৃত ছিল। তাই ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ পূরণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই কুর্তা খুলে ফেলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা.) তৎক্ষণাৎ নিজের কুর্তাটি পিঠের উপর উঁচু করে তুলে ধরে বললেন, এবার কনুই দিয়ে আঘাত কর। প্রত্যেকেই সেই মুহূর্তে ক্রোধে কাঁপছিল। কিন্তু সেই ব্যক্তির অবিচলতায় ফাটল ধরল না। সে রসুল করীম (সা.)-এর কাছে এসে তাঁর পিঠের দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তাঁর অনাবৃত পিঠের উপর ভালবেসে চুম্বন করল। অতঃপর সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হে রসুলুল্লাহ্! কোথায় প্রতিশোধ আর কোথায় এই সেবক! আমি যখন জানতে পারলাম যে এখন হুযুর (সা.)-এর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত, তখন আমার বাসনা হল আপনার বরকতমণ্ডিত শরীরকে একবার নিজের ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করার। তাই আমি সেই কনুইয়ের আঘাতকে নিজের উদ্দেশ্য পূরণের কাজে ব্যবহার করলাম, যে আঘাতটুকু সেই দিনও আমার জন্য গর্বের ছিল, আর আজও গর্বের।

কন্যাকে বললেন, হে ফাতেমা! সর্বশক্তিমান খোদা তোমার বংশ পরিচয় জিজ্ঞাসা করবেন না। তুমি যদি খারাপ কিছু করে থাক, তবে মহান আল্লাহ্ তোমাকে রসুলের কন্যা বলে ক্ষমা করবেন না। ”

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

তিনি আরও বলেন- “আমি চাই না যে আমার জামাতের সদস্যরা একে অপরকে ছোট বড় মনে করুক বা একে অপরকে নিয়ে গর্ব করুক বা একে অপরকে ছোট করে দেখুক।... কে বড় কে ছোট আল্লাহই জানেন....... কিছু লোক বড়দের সঙ্গে খুব ভদ্রতাপূর্ণ আচরণ করে, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সেই যে গরীবদের কথা শোনে, তার প্রতি অনুগ্রহ করে, তার কথাকে সম্মান করে। এমন কিছু কথা মুখে আনবে না যা তাকে কষ্ট দেয়। আপন ভাইদেরকে তুচ্ছ মনে করবে না, যখন সকলে একই ঝর্ণার পানি পান কর, কে জানে কার ভাগ্যে বেশি পানি পান করার আছে। জাগতিক নীতি দ্বারা কেউ মহৎ ও সম্মানিত হতে পারে না। খোদা তা'লার নিকট সেই ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ যে বেশি ধার্মিক।

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২-২৩)

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) ১৭ই ডিসেম্বর, ২০০৪ সালে জুমআর খুতবাতে জীবনী বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন-

“এই নিদর্শনগুলি কখনও পুরোনো হতে পারে না বরং আজও যদি আমরা আল্লাহ তা'লার রহমত অন্বেষন করতে চাই এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই এবং রসুলে করীম (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করতে চাই, তাহলে আমাদেরকে এই আদর্শগুলো অনুসরণ করতে হবে।”

আজ প্রত্যেক আহমদীর জন্য মুসলমানদের তুলনায় বড় দায়িত্ব হল তাদের আশপাশের দুর্বল ও অসহায়দের খোঁজ করা ও তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এবং নবী প্রেমের দাবীকে সত্য প্রমাণ করে দেখানো। আল্লাহ্ তা'লা এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো ! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir